সমুচিত শিক্ষা

প্রমথনাথ বিশী

এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
৬।১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীঅনিলকুমার সরকার
৬।১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
আষাঢ় ১৩৬৫

মূল্য
তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

প্রচ্ছদ :
চারু খান

মুদ্রক :
শ্রীধনঞ্জয় রায়
মুদ্রণশ্রী প্রেস
১৫।১ ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

'সমুচিত শিক্ষা' গ্রন্থের লেখক একজন শিক্ষক। এ বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা ব্যাপক। হাইস্কুল, বেসরকারী কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়—সমস্ত স্তরে তিনি কখনো না কখনো শিক্ষকতা করিয়াছেন। কাজেই শিক্ষক-জীবনের কাহিনী বলিবার অধিকার তাঁহার আছে। আমাদের শিক্ষা-জগতের নানাদিকে গোল। সরকার, রাজনীতিক, অভিভাবক, শিক্ষক, ছাত্র, ম্যানেজিং কমিটি, গভর্নিংবডি কেহই দোষমুক্ত নন। লেখক ব্যঙ্গ ও ব্যঙ্গাতিরঞ্জন দ্বারা শিক্ষা-জগতের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। অনেক সময়ে তাঁহার গল্পগুলিকে হৃদয়-হীনতার দৃষ্টান্ত মনে হইলেও বস্তুতঃ তাহা নয়, কেননা ব্যঙ্গ করুণার বিকার, করুণার অভাব নয়। গল্পগুলি পড়িবার সময়ে মনে রাখিতে হইবে যে অধিকাংশ গল্পই ইংরাজ আমলে লিখিত। তবে একালের সঙ্গে তাহাদের রূপে মিল না থাকিলেও রসে মিল আছে। আশা করি এই সামান্য মন্তব্যই গ্রন্থখানির পক্ষে যথেষ্ট।

শ্রীনীলকণ্ঠ শর্ম্মা
প্রধান শিক্ষক
এন, পি, পি, হাইস্কুল,
মধ্য প্রদেশ।

সূচী

উদার-হৃদয় বন্ধু

শ্রীরমণীমোহন মিত্র

সাহিত্যরসিকেষু,

গদাধর পণ্ডিত

নরেশচন্দ্র পাটের হাকিম হইয়াছে। জোড়াদীঘি গ্রামে তাহার অফিস। চাকরিটি পাইয়া তাহাব ভরসা হইযাছিল, কলিকাতায় না হোক কোন জেলা-শহবে সে থাকিতে পাইবে। কিন্তু এমন তাহার ভাগ্য যে, জেলা তো দূবে থাকুক, মহকুমাতে থাকাও ঘটিয়া উঠিল না—একেবাবে গ্রামে আসিয়া বসিতে হইল। গ্রামে থাকিবাব হুকুম পাইয়া তাহাব কলিকাতাবাসা মন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া উঠিল—এমন কি একবাব চাকরিতে ইস্তফা দিবার কথাও চিন্তা কবিয়া ফেলিল, কিন্তু বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনেব উৎপাতে কোন সৎকার্য করিবার কি উপায় আছে? তাহারা বুঝাইল, সবকাবী চাকবি হেলায় হারাইবার বস্তু নয়, বিশেষ করিয়া চিবকালই যে তাহাকে গ্রামে থাকিতে হইবে এমন নয়, চাকরি পাকা হইলেই চেষ্টা-চরিত্র করিয়া শহবে ট্রান্সফার হইলেই চলিবে—এমন কত হইয়াছে। তা ছাড়া গ্রামে থাকিবার কতকগুলি সুবিধাও আছে, যেমন অনেক জিনিস খুব সুলভ, আর অনেক জিনিস আদৌ মেলে না—কাজেই সে-সব কিনিয়া বৃথা অর্থব্যয় করিতে হয় না। আর গ্রামে সে-ই একমাত্র সবকাবী চাকর, কাজেই অখণ্ড সম্মান ভোগ করিতে পাবিবে—শহরে পাটের হাকিমকে চেনে কে? এই সব যুক্তির তাড়নায় আব প্রয়োজনের তাড়াতেও বটে নরেশচন্দ্র জোড়াদীঘিতে গিয়া কাজে যোগ দেওয়া স্থির করিয়া ফেলিল।

ইহা ছাড়া আরও একটা কারণ ছিল, যাহা তাহার বন্ধুবান্ধবেবা জানিত না, কিন্তু পাঠকের জানিতে বাধা নাই—নরেশচন্দ্র অল্প বয়স

হইতেই আদর্শবাদী। ইস্কুলে পড়িবার সময়ে সে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতাদি শুনিত ও কাগজে পড়িত। তখন হইতেই সে স্থির করিয়াছিল যে গ্রামে গিয়া দেশের উন্নতি করিবে। কলেজে ঢুকিয়া রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' পড়িয়াছে, গান্ধীজীর 'হরিজন' নিয়মিত পড়িত। কাজেই ইস্কুলের আদর্শবাদ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াছে বই কমে নাই। কিন্তু অবশেষে সত্য সত্যই একদিন যে তাহাকে গ্রামে যাইতে হইবে, তাও আবার পাটের হাকিম হইয়া ইহা স্বপ্নাতীত ছিল। কলিকাতায় থাকিয়া গ্রামের উন্নতি—এই ছিল তাহার স্বপ্ন। হঠাৎ তাহার মনে হইল বিধাতা পুরুষ নিতান্ত কৃপাপরবশ হইয়াই গ্রামে তাহার চাকরি করিয়া দিয়াছেন—গ্রামের ও নিজের উভয়েরই উন্নতি হইবে—'এক ঢিলে দুই পাখী' প্রবাদের বাহিরেও মরে।

এমন সময় সে শহর হইতে তাহার বাল্যবন্ধু অভয়কুমারের এক পত্র পাইল। অভয়কুমার লিখিয়াছে যে, সে আজ কয়েক বৎসর সেখানে ইস্কুলের সাব-ইন্সপেক্টররূপে রহিয়াছে। শহরের অধীনেই জোড়াদীঘি গ্রাম ; এই পথ ছাড়া জোড়াদীঘিতে যাইবার উপায় নাই। কাজেই নরেশ যেন আগে এখানে আসিয়া তাহার বাসায় ওঠে—তার পরে জোড়াদীঘিতে যাইতে পারিবে। অভয়কুমারের পত্র পাইয়া নরেশ অনেকটা আশ্বস্ত হইল—তাহা হইলে নিতান্ত সে জলে পড়িবে না। আর অভয় বাল্যকাল হইতেই বাস্তববাদী, সব দিক দিয়াই সে ছিল আদর্শবাদী নরেশের বিপরীত। নরেশ বুঝিল, বিদেশে নির্ভর করিবার মতো একটা লোক পাইবে। সংসারপটুতা বিষয়ে আদর্শবাদীরা বাস্তববাদীদের উপর নির্ভর করে, মনে মনে তাহাদের ঈর্ষা করে—ওইখানে বাস্তববাদের জিৎ।

২

জোড়াদীঘিতে আসিয়া নরেশচন্দ্র একেবারে মুষড়িয়া গেল। এতদিন সে সাহিত্যের ত্রিশিরা কাঁচের ভিতর দিয়া পল্লীকে দেখিত, পল্লী বড়ই মনোরম লাগিত। এবারে প্রথম বাস্তবে পল্লী দেখিল, সাহিত্যের বর্ণনার সঙ্গে যাহার কোন মিল নাই। তাহার আরও ধারণা হইয়াছিল, সে যখন পল্লীর প্রতি সহানুভূতি লইয়া আসিতেছে, পল্লীবাসীরা তাহাকে দু'হাত মেলিয়া আলিঙ্গন করিয়া লইবে। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটিল না। এই সাহেবী পোশাকধারী ইংরেজী শিক্ষিত বিদেশী যুবককে গ্রামেব লোক এড়াইয়া চলিতে লাগিল। দূর হইতে লোকে তাহাকে সেলাম করে কিন্তু তাহাতে প্রাণের টান নাই, সরকারী চাকরির মোহ মাত্র আছে। এমন যে হইবে বন্ধু অভয়কুমার ইঙ্গিতে বলিয়াছিল, কিন্তু আদর্শবাদী নরেশ তাহা বিশ্বাস করে নাই।

গ্রামের জমিদারের বৈঠকখানা বাড়িতে সে আশ্রয় পাইয়াছে। জমিদারবাবু কলিকাতায় থাকেন, কাজেই বৈঠকখানায় তাহার একাধিপত্য। কলিকাতায় থাকিতে গ্রামের যে বর্ণনা পাইয়াছিল তাহার কতক অংশ সত্য বলিয়া বুঝিল। খাদ্যবস্তু যে এত সুলভ হইতে পারে সে ধারণা তাহার ছিল না। কাজ তাহার সামান্যই, অধিকাংশ সময় সে বই ও খবরের কাগজ পড়িয়া কাটাইয়া দেয়। গল্পগুজব করিবার বা আড্ডা দিবার মতো লোকের সঙ্গে এখনো তাহার আলাপ হয় নাই।

একদিন সকালে সে বসিয়া আছে এমন সময়ে একটি লোক তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়া মাথা হইতে একটা ঝুড়ি নামাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। লোকটা বৃদ্ধ, শরীর কৃশ, মাথাভরা টাক, পরনে মলিন একখানি খাটো ধুতি।

লোকটি প্রণিপাত সারিয়া উঠিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—হুজুরের জন্য কিছু তরকারি এনেছি।

নরেশ দেখিল, ঝুড়ির মধ্যে কুমড়ো, লাউ, বেগুন প্রভৃতি আনাজ।

নরেশ বলিল—তা বেশ করেছ, এর দাম কত?

বৃদ্ধ মৃদু হাসিয়া বলিল—এ আমার ক্ষেতের তরকারি—দাম আর কি? তা ছাড়া হুজুরের কাছ থেকে কি দাম নিতে পারি?

বিস্মিত নবেশ বুঝিতে পারিল না এই অনুগত লোকটি কে? সে শুধাইল—তুমি কে? তোমাকে তো আমি চিনি না।

বৃদ্ধ বলিল—হুজুরকে আমি খুব চিনি। আপনি মহামান্য ইন্সপেক্টর শ্রীল শ্রীযুক্ত অভয়কুমার রায়ের বন্ধু। হুজুব, আমি এখানকার পাঠশালাব হেড পণ্ডিত।

এতক্ষণে নরেশের মনে পড়িল, অভয়কুমার তাহাকে এখানকার পাঠশালার কথা বলিয়াছিল বটে। অভয় তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল, পাঠশালার প্রতি একটু দৃষ্টি রাখিও। হেড পণ্ডিত বেজায় ফাঁকিদার। সে আরও বলিয়াছিল, গ্রামের উন্নতি কবিবাব আশা ছাড়িয়া দাও। ও সব তোমার আমার কর্ম নয়। যদি পাঠশালার পণ্ডিতটাকে একটু শাসনে রাখিতে পার তবেই অনেক করা হইবে। নরেশ শুধাইয়াছিল, পাঠশালার পণ্ডিত তাহাকে মানিবে কেন? অভয় বলিয়াছিল, আরে তুমি যে সাহেবী পোশাক পর তাহাই যথেষ্ট। বিশেষ সে যখন জানিবে যে তুমি আমার বন্ধু, তখন আমার চেয়ে তোমাকে বেশি করিয়া মানিবে। নরেশ দেখিল তাহার কথাই সত্য। সে পাঠশালার সন্ধান লইবার আগেই পাঠশালা তাহাব সন্ধান করিয়া লাউ এবং কুমড়ো লইয়া ভেট করিতে আসিয়াছে।

নরেশ বলিল—পণ্ডিত মশাই, এ সব তো আমি নিতে পারি না। এ যে প্রকারান্তরে ঘুষ নেওয়া।

এ রকম কথা পণ্ডিত জীবনে প্রথম শুনিল। সে একেবারে বসিয়া পড়িল। হাত জোড় করিয়া বলিল—হুজুর, ঘুষ দেওয়া বেআইনী একথা আমি জানি। কিন্তু লাউ-কুমড়ো কোন কালেই ঘুষ নয়, বিশেষ সবাই এসব জিনিস নিয়ে থাকেন।

নরেশ বলিল—কিন্তু এত হাঙ্গামা করবার দরকার ছিল কি? আমার প্রয়োজন অতি সামান্য, আর এসব তো এখানে খুব সস্তা!

পণ্ডিত সপ্রতিভভাবে বলিল—সেই জন্যই তো এনেছি হুজুর। দামী জিনিস দেওয়ার মতো কি আমার অবস্থা?

এই সূত্র অবলম্বন করিয়া সহজেই পণ্ডিতেব আর্থিক অবস্থার কথা আসিয়া পড়িল। নরেশ বলিল - আপনি বসুন। এই বলিয়া সে একটা মোড়া দেখাইয়া দিল। কিন্তু পণ্ডিতকে কিছুতেই বসাইতে পাবিল না। পণ্ডিত ক্রমাগত বলে—হুজুর আমার অন্নদাতা, পিতৃতুল্য --তাঁহার সম্মুখে কি বসিতে পারি?

নরেশ শুধাইল—পণ্ডিত মশাই, আপনার স্যালারি কত?

এখন 'স্যালারি' কথাটা পণ্ডিত কোন জন্মে শোনে নাই—কি উত্তর দিবে?

নবেশ তাহার অজ্ঞতা বুঝিতে পারিয়া ব্যাখ্যা করিয়া শুধাইল—আপনি পান কত?

পণ্ডিত বলিল—হুজুব, চার টাকা।

চার টাকা! ব্যাপারটা পুরাপুরি বুঝিতে না পারিয়া নরেশ শুধাইল—মাসে?

পণ্ডিত বলিল—মাসে আর পাই কই হুজুর? পাঁচ-ছ'মাস অন্তর টাকা আসে। এবারে তো এগার মাস বাকি পড়েছে।

চার টাকা বেতন তার আবার এগার মাস বাকি! নরেশের মাথা ঘুরিতে লাগিল। তাহার মনে হইল বৈঠকখানার কড়িকাঠ ফাঁক

হইয়া তাহার যত সদিচ্ছা ও গ্রামোন্নয়নস্পৃহা সোজা নির্বাণলোকের দিকে প্রস্থান করিল।

নরেশ এবারে পুছিল—তবে আপনার চলে কি করে?

পণ্ডিত বলিল—এই ক্ষেত-খামার করে, লাউ-বেগুন লাগিয়ে।

ক্ষেত-খামারের কথাটা নরেশের মন্দ লাগিল না, কারণ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালীকে এই পরামর্শ বহুবার দিয়াছেন। কিন্তু পড়া কখন হয়? তাহার সমাধান তো আচার্যদেবের বক্তৃতায় নাই। কাজেই সে পুছিল—ক্ষেত-খামার করা মন্দ নয়, কিন্তু পাঠশালার কাজে অসুবিধা হয় না?

পণ্ডিত বলিল—পাঠশালার কাজে অসুবিধা! পাঠশালা আছে বলেই তো সুবিধা হয়, ছেলেগুলোকে নিয়ে লেগে যাই।

—তবে পড়ান কখন?

—ওই কাজ করতে করতে। যেমন ধরুন, শশার মাচায় অনেক শশা ফলেছে। আমি বললাম—ওরে নন্তু, দেখ ত ক'টা শশা। নন্তু গুণে এলো তিন আর চার সাত, আর পাঁচ বারো, আর আট কুড়ি। যোগ শিক্ষা হলো। আবার ধরুন, যে দিন শশা তুলতে হবে সেদিন বিয়োগ শিক্ষা হলো। কুড়িটা শশার মধ্যে বারোটা তোলা হলো—থাকলো আটটা।

দেশজ কিণ্ডারগার্টেনের নমুনা পাইয়া নরেশ কৌতূহলী হইয়া উঠিল। পুছিল—আর গুণ, ভাগ?

পণ্ডিত হাসিয়া বলিল—ততদিন কোন ছাত্রই পাঠশালায় থাকে না। তার অনেক আগেই পাঠশালা ছেড়ে নিজের নিজের ক্ষেত-খামারে লেগে যায়।

—আপনার এই পড়াবার রীতি ইন্সপেক্টর সাহেব জানেন?

—বিলক্ষণ। সেবারে যখন আমি শশার ক্ষেতে যোগ শিক্ষা

দিচ্ছিলাম, হুজুর হঠাৎ সাইকেল করে এসে উপস্থিত। অমনি বিয়োগ শিক্ষাও দিলাম। তেত্রিশটা শশার মধ্যে তেইশটা তুলে হুজুরকে ভেট দিলাম। হুজুর সে কি খুশি!

এই পর্যন্ত বলিয়া একটু থামিয়া বলিল—হুজুর একদিন পাঠশালায় পায়ের ধূলো দেবেন।

নরেশ বলিল—অবশ্যই একদিন যাবো। কিন্তু আমার মনে হয় যে, আপনি কর্তব্য কার্যে অবহেলা করছেন।

নরেশের কথার সম্যক মর্ম বুঝিতে পারিলে পণ্ডিত হয়তো কাঁদিয়া ফেলিত, কিন্তু কি যে তাহার কর্তব্য এবং কি ভাবে যে সে তাহা অবহেলা করিতেছে বুঝিতে না পারিয়া হুজুরকে পাঠশালা দর্শনের জন্য বারংবার অনুরোধ করিয়া সে প্রস্থান করিল।

পণ্ডিতের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া নরেশের মোহ-যবনিকার এক-প্রান্ত কিঞ্চিৎ ফাঁক হইয়া গিয়াছিল বটে—কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহার বারবার মনে হইল—লোকটা জাতি-গঠন-কার্যে বিষম অবহেলা করিতেছে, ইহার একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিন্তু একবারও তাহার মনে হইল না, যে কাজের মাসিক বেতন চার টাকা এবং তাহাও এগার মাস বাকি পড়ে—সে কাজের অবহেলার অভিযোগ একেবারে অচল। তাই কেহ অভিযোগও করে না, মাহিনাও মিটায় না—অনেক দিন হইল একটা বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে। শূন্য উদরের উপর কাহারো দাবি নাই—সে দাবি যতই না কেন মহৎ হোক।

৩

বাজারের কাছে ছোট একখানি চার-চালা ঘরে গদাধর পণ্ডিতের পাঠশালা বসিয়াছে। চার-চালাখানার খড় জীর্ণ, মেঝে কাঁচা, বেড়া

ভাঙা। তারই মধ্যে কোন রকমে তিনটা ভাগ। একদিকে চিনি, বাতাসা, গুড় প্রভৃতির ছোট একখানা দোকান। সেখানে গদাধর পণ্ডিত উপবিষ্ট; হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, কাঁধের উপরে একখানা গামছা, গলায় মলিন উপবীত, হাতে একখানা ছড়ি। সেই ছড়িখানাই বোধ করি পণ্ডিতের পাঠশালার রাজদণ্ড। কিন্তু সেখানা দিয়া যে কেবল ছাত্র তাড়না চলে এমন মনে করিলে ভুল হইবে; ছাত্র তাড়নায় অবশ্য সেটা লাগে—কিন্তু এখন দোকানের মাছি তাড়াইবার কাজে নিযুক্ত। গদাধর বসিয়া দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার আমেজে ঢুলিতেছে, আর মাঝে মাঝে অনুচ্চস্বরে বলিতেছে—পড়্, পড়্। যাহাদের উদ্দেশ্যে এই উপদেশ উচ্চারিত—তাহারা, গুটি আট-দশ বালক মাঝখানের ঘরে হুটোপাটি করিতেছে। তৃতীয় ঘরটায় কয়েকটা গোরু বসিয়া রোমন্থন-কার্যে নিরত। পাঠশালার অদূরে বিখ্যাত সেই শশার মাচা—সেখানে ছাত্ররা যোগ-বিয়োগ শিক্ষা পাইয়া থাকে।

একদিন দুপুরবেলা নরেশচন্দ্র পাঠশালা পরিদর্শন করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া গদাধর শশব্যস্তে উঠিয়া পাশের দোকান হইতে একটা মোড়া আনিয়া দিয়া বলিল—বসুন হুজুর। তারপর হাত জোড় করিয়া বলিল—একেবারে খবর না দিয়ে—

নরেশ বলিল—ইচ্ছে করেই খবর না দিয়ে এসেছি—কি রকম কাজ চলে দেখবার জন্যে।

তারপর দোকানখানার দিকে চাহিয়া বলিল—এ কি, দোকানও চালান নাকি?

গদাধর পণ্ডিত বলিল—আজ্ঞে, না চালিয়ে করি কি? ছেলে-মেয়েতে চারটি। বিশেষ, এতে ছেলেদের মণকিয়া, সেরকিয়া শিখবার সাহায্য করে।

—কই, আপনার ছাত্রসব কই?

পণ্ডিত হাঁকিয়া উঠিল—ওরে নস্তু, গদা, রতা, পল্‌তা—সব কোথায় গেলি? হুজুর এসেছেন যে—সেলাম করে যা।

কিন্তু পণ্ডিতের আদেশ সত্ত্বেও কেহ আসিল না। আসিবে কে? ছাত্রেরা কেহই নাই।

পণ্ডিত বলিল—হুজুর, সবাই ছিল। আপনার সাহেবী পোশাক দেখে সব ভয়ে পালিয়েছে। দূর্, দূর্, দূর্—

শেষোক্ত সাবধান বাণী একটি কুকুরের প্রতি।

নরেশ বলিল—ও ঘরটাতে আবার গোরুও ঢুকিয়েছেন দেখছি।

গদাধর হাসিয়া বলিল—ঠিক তা নয়, আমরাই গোরুর ঘরে ঢুকেছি।

তার পরে ব্যাখ্যা করিয়া বলিল—পুরনো পাঠশালা ঘরখানা ও বছর পুড়ে যায়। সদরে লেখালেখি করে ঘর তুলবার টাকা পাওয়া যায় না। অবশ্য ইন্সপেক্টর সাহেব বলেছেন যে এজন্যে বারো টাকা দেবেন। কিন্তু দু'বছর হয়ে গেল—টাকা এলো না। কাজ তো চালান চাই। তখন বাজারের দোকানদারদের ধরলাম। তারা এই ঘরখানা তুলে দিল। শর্ত এই হলো যে এর একখানা কামরায় তাদের গোরুগুলো থাকবে। কাজেই হুজুর, এ-ঘরে ওদেরও যে অধিকার, আমাদেরও সেই অধিকার।

পাঠশালার আদ্যন্ত স্বচক্ষে দেখিয়া নরেশের কেমন বিভ্রান্তি ঘটিল। যে শিক্ষাসূত্রের একটা দিক সে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখিয়াছে তাহারই অপর দিকটা যে খড়ের জীর্ণ চার-চালায় আসিয়া পর্যবসিত—যাহাতে গোরু ও মানুষের সমান অধিকার—ইহা তাহার কল্পনারও অতীত ছিল। কিন্তু কেন জানি না তাহার মনে হইল, ইহার জন্য এই পণ্ডিতই দায়ী, আর কেহ নয়।

গদাধর বলিল—হুজুর, ঐ আমার শশার মাচা—ওখানে ছাত্ররা যোগ-বিয়োগ শিখে থাকে। একবার দয়া করে পদার্পণ—

নরেশ ক্রুদ্ধভাবে বলিল—না থাক, আর দরকার নেই।

সে পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া বাসায় চলিয়া গেল। বাসায় গিয়া সে অভয়কুমারকে দীর্ঘ পত্র লিখিয়া পাঠশালা ও পণ্ডিতের সমস্ত ব্যাপার জানাইল এবং মন্তব্য প্রকাশ করিল যে, এ সমস্তের জন্যই পণ্ডিত দায়ী। তাহাকে অবিলম্বে পদচ্যুত না করিলে জাতি-গঠন সম্ভব হইবে না। যেন ওই গদাধর পণ্ডিতই জাতি-গঠনের পথে ঐরাবতের বাধা সৃষ্টি করিয়া দণ্ডায়মান। যেন ওই একটিমাত্র বাধা অপসৃত হইলেই জাতীয় জীবনেব জাহ্নবী-ধারা অনর্গল গতিতে প্রবাহিত হইবে। চিঠিখানা লিখিয়া ডাকে দিয়া নরেশ অনেকটা স্বস্তি বোধ করিল। জাতির প্রতি কর্তব্য যেন তাহার সমাপ্ত হইল।

আট-দশ দিন পরের কথা। একদিন বিকালবেলা নবেশ বেড়াইয়া ফিরিতেছে। গ্রামের এ দিকটায় সে ইতিপূর্বে আসে নাই। একজনকে পুছিল—ওই বাড়িটি কার?

লোকটা বলিল—ওটা গদাধর পণ্ডিতের বাড়ি।

নরেশের কৌতূহল হইল গদাধর পণ্ডিতের বাড়িখানা একবার দেখিয়া আসে। সে বাড়ির কাছে গিয়া দেখিল, বাড়ি তো ভাবি। জীর্ণ খান দুই খড়ের ঘর—চারিদিকে আগাছাব জঙ্গলে পরিবেষ্টিত। সে দাঁড়াইয়া গদাধর পণ্ডিতের নাম ধরিয়া ডাকিতে শুরু করিল। পাঁচ-সাতবার ডাকিবার পরেও কোন উত্তর আসিল না, অথচ ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়া লোকের আভাস পাওয়া যাইতেছে। গদাধর পণ্ডিতের গার্হস্থ্য জীবনের পরিচয় লাভের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া সে বেড়া ধাক্কাইতে শুরু করিল। তখন ছোট্ট কাঠের একটা জানালা খুলিয়া গেল এবং ভিতর হইতে গদাধর পণ্ডিত বলিল—হুজুর, বেড়া ধাক্কাবেন না, বেড়া পড়ে যাবে।

নরেশ রুষ্টভাবে কহিল (সেদিনের পর হইতে সে পণ্ডিতের উপর রাগিয়া আছে)—ভিতরে কি করছেন? আসুন না। এতক্ষণ ডাকাডাকি করছি—আচ্ছা ভদ্রলোক তো!

পণ্ডিত বলিল—ডাক শুনেছি হুজুর, কিন্তু বাইরে যাবার উপায় নেই।

অপমানিত বোধ করিয়া নরেশ বলিল—কেন?

গদাধর বলিল—আমরা স্ত্রী-পুরুষে নল-দময়ন্তীর পালা অভিনয় করছি।

নরেশ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিল—ঠাট্টা করবার আর লোক পেলেন না?

—সর্বনাশ, হুজুরের সঙ্গে কি ঠাট্টা করতে পারি!

তারপরে সে ঘরের মধ্যে কাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল—আঃ, তুমি একটু চুপ করো তো। হুজুরকে বলবো না তো কাকে বলবো? এবার হুজুর জানলেন—দেখো এবারে কাপড় মেলে কি না।

এ পর্যন্ত বলিয়া সে পুনরায় নরেশকে লক্ষ্য করিয়া শুরু করিল—হুজুর, স্ত্রী-পুরুষে মিলে আমাদের দুখানা বস্ত্র, দুখানাই ধুতি। একখানা আমি পরি, একখানা আমার সহধর্মিণী পরে। পরতে পরতে যখন খুব ময়লা হয়, তখন কেচে নিতে হয়। রবিবারটা ছুটি—আজ একখানা কেচে শুকোতে দিয়েছি। যতক্ষণ না শুকোচ্ছে আমরা স্ত্রী-পুরুষ একখানা ধুতির দুই দিক জড়িয়ে ঘরে বন্ধ হয়ে থাকি। এ সেই নল-দময়ন্তীর কথা আর কি! ভাগ্যিস্ পুরাণে এই গল্পটা ছিল—নইলে কি যে করতাম হুজুর।

এই বলিয়া গদাধর খুব একটা সপ্রতিভের হাসি হাসিল। নরেশ হাসিবে কি কাঁদিবে স্থির করিতে না পারিয়া প্রস্থান করিল।

বাসায় আসিয়া একখানা ধুতি চাকরের হাতে দিয়া সে পণ্ডিতের বাড়িতে পাঠাইয়া দিল। বাংলা দেশের লোক সে, দারিদ্র্য দেখিয়াছে, দারিদ্র্যের নগ্নরূপও দেখিয়াছে—কিন্তু নগ্নতা ঢাকিবার এমন পৌরাণিক প্রয়াস যে ঘটিতে পারে তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। হাসির ছটায় দারিদ্র্য যে কি মর্মান্তিক তাহা এই প্রথম সে দেখিল। আজকার ঘটনায় গদাধর পণ্ডিতের সম্যক চেহারা তাহার চোখে পড়িল। এমন হৃত-দরিদ্রের হাতে যাহারা জাতি-গঠনের ভার দিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকে- দোষ সেই জাতির। গদাধর পণ্ডিতকে সমস্ত দায়িত্ব-মুক্ত বলিয়া এবারে তাহার ধারণা হইল। তাহাকে বরখাস্ত করিবার জন্য চিঠি লিখিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া তাহার আক্ষেপ হইল। স্থির করিল, কালকার ডাকেই অভয়কুমারকে সব ঘটনা লিখিয়া জানাইবে—পণ্ডিতের চাকরির যেন কোন ক্ষতি না হয়।

এই ঘটনার পরে সে আর কখনো গদাধর পণ্ডিতের পাঠশালায় বা বাড়িতে যায় নাই, পণ্ডিতকে এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিত। তাহার কাছে নিজেকে অপরাধী বলিয়া তাহার মনে হইত। এমন সময়ে সে একদিন অভয়কুমারের চিঠি পাইল। অভয়কুমার পণ্ডিতের কার্যে অবহেলার বিষয়ে তাহার সঙ্গে একমত। সে লিখিয়াছে যে, আমি গদাধর পণ্ডিতকে পদচ্যুত করিবার ব্যবস্থা করিলাম। শীঘ্রই অন্য পণ্ডিত যাহাতে ওখানে নিযুক্ত হয় তাহার ত্রুটি করিব না, আর তুমি যে কষ্ট স্বীকার করিয়া এদিকে দৃষ্টি দিয়াছ এজন্য ধন্যবাদ জানিবে।

চিঠিখানা পড়িয়া নরেশ একেবারে বসিয়া পড়িল। তাহার দ্বিতীয় পত্র কি যথাসময়ে পৌছায় নাই? গড়িমসি করিয়া চিঠি লিখিতে দু-চার দিন বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। এখন সে গদাধর পণ্ডিতকে কি বলিবে? তাহার জন্যই পণ্ডিতের চাকরি গেল—ইহা তো বুঝিতে বাধিবে না। এখন উপায় কি? পণ্ডিত অবশ্য কাজকর্ম কিছুই করে

না, কিন্তু চার টাকা মাহিনার এগার মাস বাকি পড়িলে কি খাইয়া কাজ করিবে? ছেলেমেয়ে, স্ত্রী পুরুষে যে তাহারা ছয়টি প্রাণী। আদর্শবাদের ঝোঁকে সে কি করিতে কি করিয়া ফেলিল!

পরদিন সকালবেলা নরেশ একাকী বসিয়া আছে এমন সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে গদাধর পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত। নরেশ পালাইতে পারিলে বাঁচিত, কিন্তু সে পথ ছিল না।

পণ্ডিত সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিল —হুজুর, আমার চাকরিটা গিয়েছে। এবারে বোধ হয় আমার দুরবস্থা ঘুচবে।

এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। এরকম তৃপ্তির হাসি নরেশ তাহার মুখে আর কখনো দেখে নাই।

পণ্ডিত গদগদ কণ্ঠে বলিয়া চলিল ইচ্ছে থাকলেও চাকরিটা ছাড়া সম্ভব হয়নি। তিন পুরুষ হলো আমরা এই কাজ করছি। সে কি সহজে ছাড়া যায়? অথচ জানতাম, একটু নড়াচড়া করলেই দু'পয়সা বেশি আনতে পারি। এবারে সেই সুযোগ মিললো।

নরেশ অপরাধীর কণ্ঠে বলিল—তা এ কথা আমাকে জানাবার কারণ কি?

পণ্ডিত বলিল—শুনছিলাম হুজুরের একজন পাচক ব্রাহ্মণের দরকার। আমি তো ব্রাহ্মণ, ভাবলাম একবার জেনেই আসি—এখন তো আর পাঠশালার হাঙ্গামা নেই।

নরেশ ইহার কি উত্তর দিবে? পণ্ডিতের কথায় তাহার আদর্শবাদের মাথায় 'এটম বোম' নিক্ষিপ্ত হইল। যে-দেশের পাঠশালার পণ্ডিত চাকরি গেলে খুশি হয়—অপরের পাচকবৃত্তিকে শ্রেয়ঃ মনে করে, মনে করে এবার তাহার সাংসারিক উন্নতি হইবে—সে-দেশের কি আর ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু আছে!

সে তখন পণ্ডিতকে একটা ছুতানাতা করিয়া বিদায় দিল। আর সেই রাত্রেই সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় রওনা হইল। কলিকাতায় পৌছাইয়াই চাকরিতে ইস্তফা পত্র পাঠাইয়া দিল। তাবপবে আর কখনো সে দেশের উন্নতি করিতে চেষ্টা কবে নাই। এখন সে সিভিল সাপ্লাই-এ কাজ কবে, বেতন মোটা।

শিবুর শিক্ষানবিশি

দ্বিতীয়পক্ষের গৃহিণীর মুখভাব এক বিপর্যয় ব্যাপার।

তাঁহাব মুখ একটুখানি ভার হইলে মনে হয়, ছাদের একখানি কড়িকাঠ বুঝি খসিল। তাঁহার চোখ একটু ছল-ছল করিলে অমনি মনে হয়, পাকা ধান-ক্ষেতের উপরে বুঝি জলভরা একখানা মেঘ উঠিল।

ব্যাপারটা এমন বিশদভাবে হয়তো সকলের বুঝিবার সুযোগ ঘটে না, সেই জন্যই খুলিয়া বলিতে হইল। সকলে বুঝুক আর না-ই বুঝুক, নীরদবিহারীবাবু বুঝিয়াছিলেন।

নীরদবিহারী এই গল্পের নায়ক কিংবা তাঁহার পুত্র শিবু লায়েক না হইয়া ওঠা অবধি তিনিই নায়ক ছিলেন। বিষয়টা আরও একটু খুলিয়া বলি।

একদিন নীরদবিহারী অফিস হইতে ফিরিয়া শয়ন-ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, পত্নী অম্বুজা (দ্বিতীয়পক্ষ) মুখভার করিয়া বসিয়া আছেন।

নীরদ একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—অম্বুজা ম্লান কেন ?

অম্বুজা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন—তা তুমি বুঝবে কি ? অফিসে বসে আরামে ঘুমোলে বাড়ির লোকের দুরবস্থা বোঝা যায় না।

অফিসটা যে আরামে ঘুমাইবার একটা প্রশস্ত স্থান, নীরদবিহারীর তাহা অজ্ঞাত ছিল। তিনি সভয়ে একখানি চেয়ারে বসিলেন।

অম্বুজা বলিতে লাগিলেন—তোমার ছেলের জন্য দুপুরে যদি চোখের দু'পাতা এক করতে পারি ! মাগো মা, তার চেয়ে আমাকে কালিকাপুরে পাঠিয়ে দাও।

কালিকাপুর অম্বুজার পিত্রালয়। আর শিবু নীরদবিহারীর প্রথমপক্ষের পুত্র,—বয়স পাঁচ কি ছয়।

নীরদবিহারী স্থির করিলেন যে, পুত্রকে স্কুলে পাঠাইতে হইবে, তাহা হইলে আর কালিকাপুরের সমস্যা শুনিতে হইবে না। নীরদবাবু পর দিনেই শিবুকে পাড়ার হাই স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলেন।

যাঁহারা এখনো মনে করেন যে, ছেলেকে বিদ্যা লাভের উদ্দেশ্যে স্কুলে পাঠানো হয়, কিংবা নিজেকে অর্থলাভের উদ্দেশ্যে অফিসে পাঠানো হয়, তাঁহাদের আর কি বলিব! গৃহিণীকে দুপুরবেলায় নিরঙ্কুশ ঘুমাইবার অবসরদানের আশাতেই ছেলেদের স্কুলে পাঠাইবার নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে। আবার হতভাগ্য স্বামী বাড়িতে থাকিলে ফেরিওয়ালার নিকট হইতে সওদা করিবার বিঘ্ন হইতে পারে, আশঙ্কায় গৃহিণী তাহাকে দশটার মধ্যে বিদায় করিয়া দেয়। ঐ সময়টুকুতেই গৃহিণীদের 'পূর্ণ স্বরাজ'।

এই ঘটনার পরে পুরা দুই বৎসর অতিক্রান্ত। নীরদবিহারীর পুত্র শিবু এখন উদ্ধবচন্দ্র হাই স্কুলের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ছাত্র। আট বৎসর বয়সে তাহার প্রতিষ্ঠার কথায় কেহ বিস্মিত হইলে তাহাকে বলিব যে, সে শিবুকে চেনে না। যদিচ তাহার প্রতিষ্ঠা এখন কেবল শুক্লা দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলায়, তবু চক্ষুষ্মানেরা তাহাতেই কি পূর্ণিমার আভাস দেখিতে পায় না?

স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার পরে অম্বুজা একদিন স্বামীকে বলিলেন—দেখো, শিবু নাকি গণিতে কিছু কম পেয়েছে বলে প্রোমোশন পায় নি, তুমি একবার হেড মাস্টারের কাছে যাও না।

কোন অনবহিত পাঠক হয়তো ভাবিবেন, শিবুর প্রতি বিমাতার মনোভাব ইতিমধ্যে পরিবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু সত্য অন্যরূপ। পাছে ফেল করার অজুহাতে পুত্রকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লওয়া হয়, তার

পুত্রের দ্বিপ্রাহরিক দৌরাত্ম্যে নিজের নিদ্রার বিঘ্ন ঘটে, সেই ভয়েই অম্বুজার এই নির্বন্ধ।

নীরদ বলিলেন—হাঁ যাবো বই কি।

এরূপ অবস্থায় অনেক স্বামী স্বর্ণপদ্মের সন্ধানে গিয়াছে, আর নীরদবিহারী উদ্ধবচন্দ্র হাই স্কুলে যাইবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি!

পরদিন রূপা-বাঁধানো ছড়ি হাতে নীরদবাবু স্কুলে গিয়া দর্শন দিলেন। অফিস-ঘরে হেডমাস্টার ও তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগণ অর্থাৎ অন্যান্য শিক্ষক ও কেরানীরা বসিয়াছিলেন। নীরদবাবুকে দেখিয়াই সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হেডমাস্টার নিজের চেয়ারখানি নীরদবাবুকে ছাড়িয়া দিয়া বসিতে বলিলেন। নীরদবাবু বসিলেন, কিন্তু হেড ও অন্যান্য অঙ্গের দল আর বসিলেন না, নীরদবাবুর সম্মুখে তাঁহারা কি বসিতে পারেন? সংসারে রূপা-বাঁধানো ছড়ির বড় খাতির!

কোন শিক্ষক হয়তো ভাবিতে পারেন, আমি শিক্ষক-সমাজের নিন্দা করিতেছি। কিন্তু যাহারা মরিয়া আছে, তাহাদের নিন্দায় কি ফল? যাহারা মারিয়াছে, পারিলে তাহাদের নিন্দা করিতাম বই কি!

উভয়পক্ষে শিষ্ট সম্ভাষণের পরে নীরদবাবু আসল কথায় আসিলেন, বলিলেন—শিবু বুঝি অঙ্কে ফেল করেছে?

হেডমাস্টার খাতা বাহির করিয়া দেখিলেন, শিবু তেরো নম্বর পাইয়াছে। কিন্তু হইলে কি হয়, যাহার পিতার হাতে রূপা-বাঁধানো ছড়ি, তাহার তেরোই যে তিপ্পান্ন!

হেডমাস্টার বলিলেন—হয়তো আমাদেরই ভুল হয়ে থাকবে, আচ্ছা দেখবো, আপনি ভাববেন না।

নীরদবাবু উঠিবার সময়ে বলিলেন—শিবুর জন্যে একজন গণিতের টিউটার রাখলে কেমন হয়?

এতক্ষণ শিবুর গণিত-শিক্ষক লজ্জায় অধোবদনে ছিলেন, এবার আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—আজ্ঞে, খুব ভালো হয়, ছেলে তো বুদ্ধিমান।

নীরদবাবু তাঁহাকে ত্রিশ টাকা বেতনে টিউটার নিযুক্ত করিলেন। হেডমাস্টারের ইচ্ছা ছিল তিনিই শিবুকে গ্রাস করিবেন।

নীরদবাবু সামান্য কারণে ত্রিশ টাকা খরচ করিবার লোক নহেন। জানেন যে, মাসে ত্রিশ টাকা খরচ করিয়া একাধারে মোসাহেব, ও বছর বছরে শিবুকে পাস করাইবার উদ্দেশ্যে একজন পাকা পঞ্চম বাহিনী নিযুক্ত করিয়া গেলেন।

সবাই এমন পাবে না। কিন্তু রূপা-বাঁধানো ছড়িব অসাধ্য কি? রূপা-বাঁধানো ছড়ির দণ্ডে একখণ্ড কোম্পানীর কাগজ আঁটিয়া দিলে যে বস্তু হয়, তাহাই তো মনুষ্যত্বের পতাকা।

পর বৎসর বার্ষিক পরীক্ষার পরে উদ্ধবচন্দ্র হাই স্কুলের শিক্ষকগণের মধ্যে তালিকা বিনিময় হইয়া গেল। প্রত্যেক তালিকায় কুড়ি-পঁচিশটি করিয়া ছাত্রের নাম, তাহারা প্রত্যেক শিক্ষকের ব্যক্তিগত বা প্রাইভেট ছাত্র। শিক্ষকগণ তালিকা সম্মুখে রাখিয়া পরীক্ষার খাতা দেখিতে লাগিলেন, তালিকাভুক্ত ছাত্ররা যাহাই লিখুক না কেন, উচ্চ নম্বর পাইল, ফলে তাহারা কেহই ফেল করিল না। একেবারে কিছু ফেল না করাইলে বিদ্যার মর্যাদা রক্ষিত হয় না, তাই যাহারা প্রাইভেট টিউটার রাখিতে পারে নাই—মরিতে তাহাদেরই কতক মরিল। কিন্তু একেবারে মরিল না, তাহাদের অনেকেই আগামী বৎসরের জন্য কোন না কোন শিক্ষককে প্রাইভেট টিউটাররূপে বরণ করিয়া লইল।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি, শিবু পাঁচ বিষয়ে ফেল করিয়া প্রাইভেট টিউটারের গৌরবে পাস করিয়া গেল। এমন শিবু একটি

নয়, প্রত্যেক স্কুলে অনেক, সারা বাংলাদেশে অসংখ্য। ইহার ফলে বাংলাদেশের শিবুদের ধারণা হইয়াছে যে, শিখিবার সঙ্গে পাস করিবার সম্বন্ধটা নিতান্ত আকস্মিক। শিবুদের অভিভাবকগণও ঐ প্রথায় 'শিখিয়াছে'। তাই তাহারা ছাত্রদের 'কি শিখলে?' জিজ্ঞাসা করে না, জিজ্ঞাসা করে 'পাস করলে কিনা?'

না শিখিয়া যে বিদ্যা লাভ হয়, সেই বিদ্যায় বাংলাদেশ আজ অন্যান্য প্রদেশের উত্তমর্ণ। সরস্বতীর বাজারে এমন পারমিট-বিতরণের প্রথা আর কোথায়? বিদ্যার বাজারে বাঙালী আজ শ্রেষ্ঠ চোরাকারবারী। স্কুলে না ঢুকিয়া যদি কেহ শিখিয়া থাকেন, তবে তিনি রহস্য হয়তো ভালো বুঝিতে পারিবেন না আশঙ্কা করিতেছি, তাই ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইল।

২

বাংলাদেশের স্কুলগুলি এক বিচিত্র বস্তু, বিচিত্রতর তাহার ইতিহাস। এখনো কেহ কেহ মনে করেন যে, শিক্ষাদানই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। সেই ভুল ভাঙিবার উদ্দেশ্যেই এই রচনা।

দুপুরবেলায় জননী নির্বিঘ্নে ঘুমাইবেন, ছেলেগুলাকে কোথাও আটকাইয়া রাখা প্রয়োজন। পিতা অফিসে যাইবেন, সেই সময়ে ছেলেগুলা পথে বাহির হইয়া গাড়ী-ঘোড়া চাপা পড়িতে পারে, তাহাদের কাহারো হেফাজতে রাখিতে হইবে। কোন ছেলের বাপ-মা মরিয়াছে, কোন ব্যক্তি বা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছে, ছেলেগুলিকে যতক্ষণ সম্ভব, বাড়ি হইতে কোথাও নিরাপদে রাখিতে হইবে। এই সব অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের তাগিদেই বাংলাদেশের স্কুলগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। ছেলেগুলাকে আটকাইয়া রাখিবার

উদ্দেশ্যে স্কুলসমূহের সৃষ্টি। তবে ঐ কাজটি করিতে গিয়া শিক্ষকেরা দেখিতে পাইয়াছেন নিছক কয়েদ করিয়া না রাখিয়া সময়টাতে কিছু কিছু পড়াইলে অবসর যাপনেব কাজটা সহজ হইয়া আসে। তাই কিছু কিছু পড়াইবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। আব ঐরূপভাবে পড়াইতে গিয়া দেখা গিয়াছে যে, ছাত্ররা 'পাস' কবিয়া বাহিব হইলে আদর্শ কেরানী হয়, চাকরিও পাইয়া থাকে। এখন অবশ্য আর চাকবি পায় না, তবু অভ্যাসটা রহিয়া গিয়াছে। পুবাতন অভ্যাস সহজে যায় না।

গভর্নমেণ্ট যে সাহায্য দান করেন, তাহাতে স্কুল চলা সম্ভব নয়, কিন্তু বেশি দিবার তাহাদেব গরজ কি? শিক্ষকদেব তো অতিবিক্ত ভোট নাই, কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রবা তো ভোট দিতে পারিবে না। ছাত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক হইলেও অপ্রাপ্তবুদ্ধি নয়, তাহারা বুঝিয়া লইয়াছে যে, তাহাদের প্রদত্ত বেতনেই স্কুল চলে, কাজেই তাহারাই প্রকৃত মালিক। তাহারা জানে যে, হেডমাস্টাবেব ঘাড়ে একাধিক হেড নাই যে, তাহাদের তিরস্কার করিতে সাহস পাইবে। আর তিবস্কাব করিলে এক স্কুল ছাড়িয়া অন্য স্কুলে গিয়া ভর্তি হইতে কতক্ষণ? কাজেই স্কুলে ছাত্র নিরঙ্কুশ।

অপরদিকে শিক্ষকেরা দেখিয়াছেন যে, বেতন যা তাঁহারা পান তাহাতে চলে না, তাই তাঁহারা ছাত্রদের মধ্য হইতে প্রাইভেট ছাত্র সংগ্রহ করিয়া সংসার চালাইবার উপায় করিয়া লন। একজন শিক্ষক সকাল হইতে মধ্যবাত্রি পর্যন্ত ১০।১২টি করিয়া ছাত্র পড়ান, স্কুলে আসিয়া তাঁহারা সত্যই বিশ্রাম পান। 'ওরে পড়্ পড়্' বলিয়া শিক্ষক মহাশয় ক্লাসের মধ্যে বসিয়াই ঘুমান। কে কাহাকে বলিবে, সকলেই যে ঘুমাইতেছে। হেডমাস্টারের হেডও ঘুমেব ভারে কাতর। ইহাতেও এক বকম চলিতে পারিত, সুখেই চলিতে পারিত, কিন্তু মাঝখানে স্কুল-কমিটি নামে একটি রাহু আছে। শিক্ষকদের নির্জিত

করিয়া রিজার্ভ ফাণ্ডটি পুষ্ট হইয়া উঠিবামাত্র স্কুল-কমিটিরূপ রাহু তাহাকে গ্রাস করিয়া পালায়।

আর দেশের রাজনীতিকগণ দেখিয়াছে যে, তাহাদের হইয়া ভোট সংগ্রহ করিবার, তাহাদের বিপক্ষ দলের সভা ভাঙিবার, প্রয়োজন হইলে তাহাদের হইয়া শহীদ হইবার বিচিত্র উপাদান ছাত্রসমাজ। তাহারা ছাত্রদের আহ্বান জানায়। তাই যখন ব্যাকরণ শিখিবার সময়, ইতিহাস পড়িবার সময় ছাত্ররা দলে দলে পতাকা লইয়া বাহির হইয়া পড়ে, মিটিং ভাঙে, মাথা ভাঙে, আর শূন্যকক্ষে বসিয়া শিক্ষকেরা হাঁফ ছাড়েন, নিবিবিলি ঘুমাইবার সুযোগ পান। যদিচ এই রাজনীতিক দলই স্কুলকে সাহায্য হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে, তৎসত্ত্বেও শিক্ষকেরা তাহাদের বড় অনুগত, কারণ রাজনীতিকরা টাকা না দিলেও শিক্ষকদের ঘুমাইবার অবসর দেয়। আবার দেশের যে রাজনীতিক দলটি ভোটে হারিয়া যায়, তাহাদের হঠাৎ মনে পড়ে, দেশের শিক্ষায় কোথাও ত্রুটি রহিয়াছে, নহিলে তাহারা হারিবে কেন ? আর যে দলটি জিতিল, প্রয়োজন মিটিয়া যাইতেই ছাত্রদের আদেশ করে : তোমরা এবার স্কুলে ফিরিয়া যাও।

কিন্তু ফিরিয়া যাওয়া তো সহজ নয়, পরাজিত পক্ষ আসিয়া উস্কানি দিয়া তাহাদের বাহির করিয়া লয়। ফলে দেশের কাজ করিতে গিয়া ছাত্ররা আর শিখিবার সময় পায় না, কিন্তু না শিখিলেও তাহারা বছরে বছরে নিয়মিত পাস করিয়া যায়—এমন আজ পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে।

কাজেই সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে, বর্তমান বাংলাদেশের কর্ণধারগণ আজ সেই সব অশিক্ষিত 'পাস করা' বিদ্বৎসমাজ! আমাদের শিবুও সেই দল বৃদ্ধি করিবার জন্য উদ্ধবচন্দ্র হাই স্কুলে চন্দ্রকলার মতো দিনে দিনে বর্ধমান।

৩

স্কুলের সময়ে শিবু ও তাহার সঙ্গিগণ, বাংলাদেশের নাকি যাহারা ভবিষ্যৎ, পথে খেলা করে, বিনাভাড়ায় ট্রামে উঠিয়া যাতায়াত করে, কণ্ডাক্টার কিছু বলিতে পারে না, কারণ আগামী ধর্মঘটের সময়ে 'জনগণের সহানুভূতির' উপরে তাহাদের নির্ভর করিতে হইবে। শিবু ও তদীয় সতীর্থগণ পতাকা লইয়া পথে পথে হাঁক দিয়া ফেরে, সভ্য করে এবং সভা ভাঙে। সবই করে কেবল পড়াশোনা ছাড়া, যেহেতু কেহ পড়িতে বলে না, কিংবা না পড়িলেও যেখানে পাস হওয়া যায়, সেখানে পড়িবে কোন্ নির্বোধ ?

বৎসরান্তে পরীক্ষা হইল, শিবুর দল পরীক্ষা দিল। শিক্ষকেরা পরস্পরের মধ্যে তালিকা বিনিময় করিয়া বলিলেন—একটু দেখবেন। সকলেই সমব্যথী, ফলে ভালো করিয়াই দেখিল এবং শ্রীমান্ শিবু প্রত্যেকটি বিষয়ে ফেল করিয়াও পাস করিয়া গেল।

এই ভাবে শিবু না শিখিয়াও পাস করিতে করিতে প্রবেশিকা ক্লাসে গিয়া উঠিল। প্রবেশিকার টেস্ট পরীক্ষাতেও সে পাস করিল। টেস্ট পরীক্ষাতে কোন ছাত্রকে আটকাইয়া রাখে, এমন সাহস কোন স্কুলের নাই। সাধারণ নিয়ম এই যে, বকেয়া বেতন চুকাইয়া দিলেই ছাত্রদের পরীক্ষায় বসিতে অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু কোন কারণে কোন ছাত্রকে আটকাইলে অমনি তাহার অভিভাবক আসিয়া হাজির হয়, বলে—ছেলেটা বুদ্ধিমান আছে, ঠিক করে নেবে। আপনারা পাঠিয়ে দিন না।

যে ছেলে সারা বছর পড়িয়া ফেল করিল, দুই মাসের মধ্যে সে যে কি ঠিক করিয়া লইবে, ভগবানই জানেন। তবে কিনা হাঁ, বুদ্ধি আছে, অর্থাৎ কিনা পাঠ প্রস্তুত করিতে না পারিলেও পরীক্ষায় নকল

করিবার উপায় করিয়া লইতে পারিবে। ইহা ছাড়া অভিভাবকের ভরসার তো আর কোন কারণ দেখি না। অভিভাবকটি এক রকম জানিয়া শুনিয়াই পুত্রের অসাধুতাকে সমর্থন করে—কিংবা, অসাধুতার উপবে ভরসা করিয়াই পুত্রের জন্য অনুরোধ করিতে আসে।

হেডমাস্টার ভাবেন, দূর ছাই, আটকাইয়া কি লাভ! ছাত্র কমিয়া গেলে স্কুল-কমিটির রোষে পড়িতে হইবে।

শিক্ষক ভাবেন, না আটকানোই ভালো, পবেশিকা পবীক্ষায় ছাত্র যত বেশি হয়, পবীক্ষক হিসাবে খাতা তত বেশি পাইবার সম্ভাবনা।

বিশ্ববিদ্যালয় দেখে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর মূল্য পনেরো টাকা, যত বেশি ছাত্র হয় ততই লাভ। তাহা ছাড়া 'advancement of learning' তো উপরি পাওনা। এই ভাবে বিদ্যার প্রসার ঘটিতে ঘটিতে বাংলাদেশ বিদ্যার প্রায় সাহারা মরুভূমি হইয়া উঠিয়াছে।

সকলেই জানে যে, লেখাপড়া কিছু হইতেছে না, এমন করিয়া কিছু হওয়া সম্ভব নয়, তবু কেহ মুখ খুলিয়া বলিতে সাহস করে না; কারণ, কেহ শিক্ষক, কেহ পরীক্ষক, কেহ পরীক্ষার গার্ড, কেহ পুস্তকের দপ্তরী, আর কেহ বা পুস্তকের লেখক। বর্তমান প্রথা অন্তর্হিত হইলে সকলেরই আয়ের তোরণ হইতে মোটা রকমের খান কয়েক ইট খসিয়া যাইবে। অতএব—অতএব বিদ্যার প্রসার চলিতে থাকুক। একটা সমস্ত দেশ যখন মনের সঙ্গে চোখ ঠারিতে শুরু করে, তখন···তখন কি হয়, পাঠক তুমিই বলো, আমি তো অনেকটা বলিলাম।

৪

এখন পাস করিবার আশায় শিবু আর প্রাইভেট টিউটারের কৃপার উপরে নির্ভর করে না, সে এখন নিজের পথ নিজে করিতে

শিখিয়াছে। আসন্ন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ব্যবস্থায় সে ও তাহার বন্ধুগণ উদ্যত হইল। বই লইয়া পরীক্ষা-গৃহে প্রবেশ সে তো পুরাতন প্রথা। এখন বিজ্ঞানের কৃপায় নূতন ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে। তাহাতে ধরা পড়িবার উপায় নাই। তবু পরীক্ষার গার্ডদের একটু সাবধান করিয়া দেওয়া ভালো মনে করিয়া শিবু গণিতের শিক্ষককে বলিল—স্যার, খবর শুনেছেন, রংপুরের এক গার্ডকে কে যেন মেরে ফেলেছে!

গণিতের শিক্ষক গণিতের অনেক দুরূহ সমস্যা বোঝে, শিবুর ইঙ্গিতটাও বুঝিলেন, বলিলেন—বাবা আজকাল তো ছাত্রদেরই যুগ।

শিবু বলিল—আপনারা তো বঝবেনই।

পরীক্ষা-গৃহে যেসব নির্বোধ গার্ড ছাত্রদের অসাধুতা ধরিয়া ফেলে, তাহাদের কেহ আহত হয়, কেহ নিহত হয়, কাহারো ঘর পোড়ে। যাহারা দৈনিক পাঁচসিকা পয়সার জন্য ছাত্রদের অসাধুতা ধরে—তাহাদের এমনি হওয়া উচিত বলিয়া সকলের বিশ্বাস। ছাত্র ও অভিভাবক কাহারো সহানুভূতি তাহারা পায় না, তাহারাই তো জ্ঞানের প্রসারের পথে বাধা। দৈনিক পাঁচসিকা যাহাদের মজুরী, তাহাদের রক্ষা করিবার ভার কাহার উপরে! যদি তাহারা মজদুর হইত, তবে না হয় একটা ধর্মঘট করা চলিত। ঠেকিয়া ঠেকিয়া গার্ডরূপী শিক্ষকগণ এখন চতুর হইয়া গিয়াছেন।

উদ্ধবচন্দ্র হাই স্কুলে পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। পাশেই একটা সরকারী পার্ক। ছাত্রবন্ধুগণ সেখানে দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে মেগাফোন-যোগে পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর হাঁকিতেছে:

'Akbar, the Great Mughal Emperor was born in —'

আর শিবু ও তাহার উৎকর্ণ বন্ধুগণ সেই দৈববাণী শুনিয়া দিব্য

লিখিয়া যাইতেছে, কাহারো আপত্তি করিবার কিছুই নাই ; কেন না, যাহারা বলিতেছে তাহারা স্কুলের এলাকার বাহিরে অবস্থিত।

এই ভাবে সব প্রশ্নপত্রের উত্তর লেখা হইল। গণিতের পরীক্ষার দিন শিবু বিপদে পড়িল। কানে দৈববাণী সে শুনিতে পাইল না। আগের দিন বিকালে ফুটবল খেলিবার সময়ে একটা বল তাহার কানে লাগিয়াছিল—এখন সে বুঝিতে পারিল, সাময়িকভাবে তাহার শ্রবণেন্দ্রিয় বিকল। সে যাহা পারিল লিখিয়া উঠিয়া আসিল।

পরীক্ষার পরে তদ্বির বলিয়া একটা প্রথা আছে। তখন কলিকাতার অর্ধেক লোক চঞ্চল হইয়া ওঠে। অভিভাবকগণ কোন রকমে একটা পরিচয়ের সূত্র আবিষ্কার করিয়া পরীক্ষকের গৃহে গিয়া দেখা দেয়। শিষ্ট সম্ভাষণ ও মিষ্ট আলাপের পরে বিদায়ের সময়ে পুত্রের রোল নম্বর দিয়া বলে—একটু দেখবেন।

তারপর স্মরণ করাইয়া দেয়—আর সব বিষয়েই পাস করবে, কেবল আপনার পেপারেই একটু সন্দেহ আছে।

ভাবটা, এমন ছাত্রকে ফেল করানো জাতীয় উন্নতির পথে বাধা স্থাপন।

পরীক্ষকেরা ভারি বুদ্ধিমান : সব ইঙ্গিত বুঝিতে সক্ষম। তাঁহারা রোল নম্বর টুকিয়া লন।

ইহার উপরে আছে পরীক্ষকদের মধ্যে তালিকা-বিনিময়—গণিতের পরীক্ষক ইংরেজীর পরীক্ষককে, ইংরেজীর পরীক্ষক ইতিহাসের পরীক্ষককে—এমনি ভাবে চলে। কেবল বাংলার পরীক্ষককে কেহ বিশেষ খাতির করে না, বাংলা পরীক্ষায় লিখিলেই পাস, না লিখিলেও ফেল নয় বলিয়া বাঙালীর ধারণা। এমন ব্যাপক তদ্বির-প্রথা থাকিতে আদৌ যে কেহ ফেল করে, ইহাই বিস্ময়ের। যাহারা ফেল করে বুঝিতে

হইবে সংসারে তিন কুলে তাহাদের কেহ নাই—তাহারা পাস করিলেই বা কাহার কাজে লাগিবে ?

আমাদের সংবাদ এই যে, শিবু দৈববাণীর কৃপায় একটিমাত্র বিষয়ে কম নম্বর পাইয়াছে, গণিতে ১৮ নম্বরের বেশি পায় নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া গেল। মাত্র এক বিষয়ে ফেল করিলে খাতাটি পুনরায় পরীক্ষা করা হয়। পুনরায় পরীক্ষার ইঙ্গিতের মানেই কিছু নম্বর বাড়াইয়া দেওয়া,—ইহাই নিয়মের মর্ম। নিয়ম ও তদ্বিরের যুগ্ম আশীর্বাদে শিবুর আঠারো তেত্রিশ হইল —অতএব ধরিয়া লইতে হইবে শিবু গণিত শিখিয়াছে।

শিবুর পাস করার সংবাদে নীরদবাবু বন্ধুদের ডাকিয়া ভোজ দিলেন। অম্বুজা অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন—যত আদিখ্যেতা।

যথাকালে শিবু কলেজে ভর্তি হইল।

৫

শিবু কলেজে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কলেজ-জীবনের মতো এমন নিরঙ্কুশ সুখের সময় আর নাই। কলেজে আসিলেও চলে, না আসিলেও চলে, তাহাতে বিদ্যার বা উপস্থিতির তারতম্য ঘটে না। সে আরও বুঝিতে পারিল, বিদ্যালয়েব শিক্ষকদের চেয়ে কলেজের অধ্যাপক আরও বেশি অসহায়। দরকার হইলে 'সরল জীবনযাত্রার অজুহাতে' শিক্ষক গোরু চরাইতে পারে, ঘাস কাটিতে পারে, কিন্তু অধ্যাপককে একটা মর্যাদার ভান রাখিয়া চলিতে হয়, নতুবা সরকারী কলেজের ভদ্রবেতনের অধ্যাপকদের কাছে মান থাকে না। আর ছাত্র-স্বাধীনতা ! বিদ্যালয়ের স্বাধীনতার জানালাগুলি মাত্র খোলা, কলেজে জানালা-দরজা সবই খোলা। এমন কি, ছাদের

অনেকটা অংশও খোলা। স্বাধীনতার বন্যায় ঘর ভাসিয়া কাপড়-জামা ভিজিয়া যায়। শিবু দেখিল, কলেজে অধ্যাপকেরা ছাড়া আর সবাই জেণ্টেলমেন।

ইতিমধ্যে শিব কয়েকজন সহপাঠীকে লইয়া দল গড়িয়া সভা-সমিতি কবিতে লাগিল। সে-সব সভায় সে বক্তৃতা করিত, সহপাঠীরা ধন্য ধন্য করিত—কারণ, শিবু তাহাদের প্রায়ই ডিমের মামলেট খাওয়াইত এবং চা পান করাইত।

মানুষের মস্তিষ্কের একটা ক্ষুধা আছে। আগে যখন বিদ্যালয়ে মুখস্থ করিবার প্রথা ছিল, তখন সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী কবিতায় স্মরণশক্তির সেই গহ্বর পূর্ণ হইত। এখন সেই কু-প্রথা অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু মগজের স্বাভাবিক ক্ষুধা তো লোপ পাইবার নয়, অথচ মুখস্থ প্রথা রহিত। তাই যত সব উড়ো কথা, শোনা কথা, কাগজের বুকনিতে ছাত্রদের সেই গহ্বর ভরিয়া ওঠে, আর সভা-সমিতির উপলক্ষ্য পাইলে সেই কীটগুলি বর্ষাকালের উইয়ের মতো পাখা মেলিয়া আকাশ ভরিয়া দেয়। সকলে বলে শিব একজন 'প্রোগ্রেসিভ থিংকার'।

এই ভাবে বক্তৃতা করিতে করিতে এবং ডিমের অমলেট খাইতে খাইতে একদিন শিবু দেখিল যে, সে বি. এ. পাস করিয়া ফেলিয়াছে। বাঙালী ছাত্র না শিখিয়া পাস করে, না পড়িয়া শেখে, কুমীরশাবক যেমন জন্মিয়াই সন্তরণপটু, বাঙালী-সন্তান তেমনি সহজাত-শক্তির বলে বিদ্যাবারিধির পারঙ্গম। বাঙালীর এত গুণ অন্য প্রদেশের লোকে বুঝিতে পারে না, বাঙালী তাই তাহাদের নির্বোধ বলে।

শিবুর পাসের সংবাদে নীবদবাবু আনন্দিত হইয়া বলিলেন—এমন যে, হবে, তা আগেই জানতাম। ওর জন্মকালে আমার অনেক কালের পোষা ছাগলটি মরিয়াছিল—

অম্বুজা বলিলেন—নইলে আর এমন সুসন্তান জন্মায়? নাও, অনেক হয়েছে। এবারে একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে বলো।

শিবব বিত্তার যোগ্য চাকরি বাংলাদেশে মিলিতে পারে না, তাই সে সর্বভারতীয় পরীক্ষায় যোগ দিবার উদ্দেশ্যে দিল্লী রওনা হইল। অন্য প্রদেশের ছাত্ররা খাটিয়া পড়ে, শিখিয়া পাস করে, তাহাবা বাঙালী ছাত্রদের মতো প্রোগ্রেসিভ নয়। প্রতিযোগিতামূলক পবীক্ষায় তাহারা পাস করিল। শিবু সমস্ত বিষয়ে কাজেই একুনে একটি সুবৃহৎ শূন্য পাইয়া ফিবিয়া আসিল।

সে ফিবিয়া আসিয়া বলিল—নাঃ, 'ওরা' বাঙালীকে কখনো চাকরি দেবে না, বাঙালী ছাত্রদেব প্রতি 'ওদের' অত্যন্ত বিদ্বেষ। 'ওরা' থাকা অবধি বাঙালীর কোন আশা-ভরসা নেই।

নীরদবাবু এখন পেন্সনপ্রাপ্ত। অনেককাল আগেই সাধনোচিত ধামে তাঁহাব প্রস্থান কবা উচিত ছিল। কিন্তু নিয়মিতভাবে চ্যবনপ্রাশের গুলি মারিয়া যমরাজের বাহনগুলিকে তিনি ঠেকাইয়া রাখিয়াছেন। তিনি পার্কে, ক্লাবে, কবিরাজি দোকানে পেন্সনপ্রাপ্তদের মধ্যে 'ওদেব' বাঙালী-বিদ্বেষের নূতন উদাহরণ ছড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পেন্সনপ্রাপ্তরা একবাক্যে, তাঁহার উক্তি স্বীকার করিয়া লইল, 'ওদের' উপরে তাহাদের বড়ই রাগ কেননা, সরকারী চাকুরে সকলেবই ভাগ্যে D.A. জুটিয়াছে, কেবল পেন্সনধারীদের সে সুযোগ দেওয়া হয় নাই। এমন গভর্নমেণ্ট বাঙালী-বিদ্বেষী না হইয়া যায় না।

সন্ধ্যাবেলায় কবিরাজি দোকানে মোদক গিলিতে গিলিতে বৃদ্ধের দল বলিল—না 'ওরা' আর বাঙালীদের করে খেতে দিল না, নইলে শিবুব মতো সোনার টুকবো ছেলে—

বাক্য শেষ হইতে পারিল না, মোদকের আঠায় তখন গলা আটকাইয়া ধরিয়াছে।

শিবু এখন যত্রতত্র বাঙালীর প্রতি 'ওদের' বিদ্বেষের কথা প্রচার করিয়া বেড়ায়, আর অবসর সময়ে জীবিকার্জনের পন্থা ভাবে। সে একবার ভাবে সাহিত্য করিবে, আর একবার ভাবে সিনেমার জন্য সিনারিও লিখিবে, কখনো ভাবে সব ব্যবসার সেরা ব্যবসা পলিটিক্সে নামিবে। ঐ তিনটির একটিতে সে যাইবেই, কারণ না শিখিয়া যে বিদ্যা অর্জিত হয়, তাহাতে ঐ তিনটি ছাড়া আর গত্যন্তর কোথায়?

শিবুর শিক্ষানবিশির এই ইতিহাস বাঙালী সমাজের সবচেয়ে বড় 'সিক্রেট'; ইহা ফাঁস করিয়া দিবার অপরাধে শিবব দল এখন লেখকের উপরে অসন্তুষ্ট না হইলেই রক্ষা।

গাধার আত্মকথা

পাঠক, তোমাকে আমার জীবন-কাহিনী বলিব। কিন্তু সে কথা শুনিবার আগ্রহ তোমার হইবে কি? তুমি কত জনের জীবনকথা পড়িয়াছ—তাঁহারা সকলে মহাপুরুষ ব্যক্তি। তাঁহাদের কেহ বা নেপোলিয়ান, কেহ বা হেনরি ফোর্ড, কেহ বা হিটলার, মুসোলিনি বা ওই রকম কিছু। তাঁহাদেব যুগান্তকারী প্রাণান্তকারী কীর্তির ভাবে ইতিহাসের লতাবিতান ভারাক্রান্ত। তাঁহাদের তুলনায় আমি তুচ্ছ, আমি নগণ্য। আমি এতই সামান্য যে ইতিহাস তো দূরের কথা, কাহারো জমাখরচেব খাতার প্রান্তেও আমার স্থান পাইবার আশা নাই। তবে কোন্ ভরসায় আত্মকথা বলিতে উদ্যত হইয়াছি? কোন ভরসায় জোনাকি আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, কেন আকাশে কি গ্রহ-নক্ষত্রের অভাব? তবে কোন ভরসায় প্র-না-বি-র মতো লেখক কলম ধারণ করে, কেন বঙ্গ-সাহিত্যে কি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ নাই? তবে কোন্ ভরসায় বেকারতম ব্যক্তি পূজা-সংখ্যা প্রকাশ করিতে উদ্যত হয়, কেন আনন্দবাজার পত্রিকা, বসুমতী প্রভৃতি কি ব্যবসা গুটাইয়াছে? আত্মপ্রকাশের প্রেরণায় আমি আত্মকথা বলিতে উদ্যত হইয়াছি, জগতের মহত্তম শিল্পীর সঙ্গে ওইখানে আমার ঐক্য, যদি-চ আমি নিরামিষাশী, নিরীহ, বহুভারপীড়িত সামান্য জীব! স্বভাব-বিনয়ী হইলেও সত্যের খাতিরে বলিব আমি একেবারে নির্গুণ নই। অপরের dirty linen পরিষ্করণ যদি সদ্‌গুণ হয়, তবে আমি একেবারে গুণহীন নই, কারণ ওই কাজে আমার সহযোগিতা আছে; অবশ্য তোমাদের অনেকের মতো কাজ আমি সর্বসাধারণের সমক্ষে

করি না। আর আমার পদমর্যাদা তোমাদের অনেকের চেয়ে কম নয়। এহেন আমি—ও হরি আমার পরিচয় এবং নাম-ধাম এখনো বলি নাই বুঝি! পাঠক আমাকে যাহা ভাবিতেছ, আমি তাহা নই। আমি একটি গাধা।

আমার নাম? গাধার আবার নাম কি? তাহাকে যে-নামেই ডাকো না কেন সে গাধাই থাকিয়া যায়। চিরকাল আমি গাধা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছি—বড় জোর কেহ আদর করিয়া ডাকে গাধু। আর ধাম? রজকালয়। হ্যাঁ, মনে পড়িল, একটা নাম আমার আছে বটে, তবে সেটা ব্যক্তিগত নয়, দলগত। আমরা সবাই রামু ধোপার গাধা। রামু ধোপার গাধার সংখ্যা পঞ্চাশের উপর। রামু নৈকষ্য কুলীন এবং ধনী। পঁয়ত্রিশ বার তাহার বাড়ি পুড়িয়াছে।

পাঠক, তোমার কৌতূহল হইতে পারে এতগুলি গাধার মধ্যে রামু আমাকে চিনিত কি প্রকারে? এমন কৌতূহল হইলে বুঝিতে হইবে যে গর্দভতত্ত্ব সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান আশানুরূপ বিস্তৃত নয়। আমাকে চিনিবার রামুর কি প্রয়োজন? সব গাধাই এক মাপের, এক জাতের, এমন কাজ নাই যাহা সকলকে দিয়া সমান ভাবে না হয়। চিনিবার প্রয়োজন কি? এ তো আর তোমাদের কলেজের কাজ নয় যে Specialisation অপরিহার্য! যে অঙ্ক পড়ায়, সে ইংরেজী পড়াইতে পারিবে না! বরঞ্চ স্কুলের কাজের সঙ্গে আমাদের মিল অনেকটা বেশি! স্কুলের যে মাস্টার অঙ্ক পড়ায়, পরের ঘণ্টায় সে-ই সংস্কৃত পড়াইতেছে, তার পরের ঘণ্টায় বটবৃক্ষতলে মডেল-নেপোলিয়ানের মতো দাঁড়াইয়া বালকগণকে সে ড্রিল শিখাইতেছে, আর স্কুল ছুটি হইলে হিসাবের খাতায় ঘর-পূরণ করিয়া তবে তাহার ছুটি! কিন্তু ইহাতেই স্কুল-মাস্টারের বহুমুখিতা সীমাবদ্ধ মনে করিলে

ভুল হইবে। সাড়ে দশটায় স্কুল খুলিবার আগে ঘাড়ের উপরে ঝাড়ন ফেলিয়া সে ঘরগুলি ঝাঁট দিয়াছে এবং টেবিল-চেয়ার ঝাড়-পোঁছ করিয়াছে! ছাত্ররা এসব দৃশ্য দেখে, তাহারা বুঝিতে পারে না মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করিবে, কারণ তিনি মাস্টার, না কেরানী, না ভৃত্য! শেষ পর্যন্ত ছাত্ররা তাহাকে নিম্নতম পদবীটাই দান করে। এত শক্তি ব্যয় করিয়াও শিক্ষকদের শক্তি অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। উপনিষদের ব্রহ্মা যেমন জগৎ আচ্ছন্ন করিয়াও দশ আঙ্গুল পরিমাণে তদতিরিক্ত, শিক্ষকেরও সেই রকম। এই সমস্ত বিচিত্র কাজ করিবার পরেও প্রাইভেট টিউটার অর্থাৎ বাজার সরকার, দর্জি ও ফেরিওলা প্রভৃতি মূর্তি তাহার আছে। কিন্তু কি বলিতে কি বলিতেছি—আমার ওই এক মুদ্রাদোষ, নিজের কথা বলিতে গেলেই শিক্ষকের কথা মনে পড়িয়া যায়। অনেকে সন্দেহ করে কোথায় যেন একটা প্রচ্ছন্ন যোগ আছে। কিন্তু সে সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক, আমি শিক্ষক নই, আমি গাধা।

রামু ধোপার বাড়ির নিকটে ঘাসে ঢাকা এক প্রশস্ত মাঠ আছে। কাজের অবসরে সেখানে আমরা চরিয়া বেড়াইতাম এবং ছুটাছুটি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলে কচি ঘাস ছিঁড়িয়া খাইতাম। আমরা ঘাস খাই শুনিয়া মানুষে বিস্মিত হয়—কিন্তু এ সংসারে ঘাস না খায় কে? গাধাতে খাদ্য বলিয়া ঘাস খায়, মানুষে শাক বলিয়া ঘাস খায়, সাহেব লোকে ভাইটামিন বলিয়া ঘাস খায়, আর শিক্ষকেরা ডুবিয়া ঘাস খায়, নতুবা তাহাদের ছাত্রগণের এমন আশ্চর্য বিদ্যা হয় কিসের প্রভাবে?

রামুর পঞ্চাশটি গাধার সকলেই একদলভুক্ত ছিল মনে করিও না। আমাদের মধ্যে অন্ততঃ দশটি দল ছিল। আমরা চার গাধায় একটি দল। শুনিয়াছি মানুষের দল পাকাইতে চার জনেরও প্রয়োজন হয়

না, একজনেই যথেষ্ট, সে একসঙ্গে সেক্রেটারি ও প্রেসিডেণ্ট হইয়া কাজ চালাইতে থাকে। এ বিষয়ে মানুষ কিছু আগাইয়া আছে, তবে শীঘ্রই আমরা ধরিয়া ফেলিব।

একদিন শরৎকালের প্রাতঃকালে আমরা মাঠে চরিয়া বেড়াইতেছিলাম আর কথোপকথনের অবকাশে কচি কচি ঘাস ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছিলাম। সেই ঘাসের স্বাদ আর শরতের রোদ, দুইয়ে মিলিয়া আমাদের মনে এক অভূতপূর্ব আনন্দের সৃষ্টি করিল। আমি বলিলাম—এমন সকালবেলা, এসো সকলে মিলিয়া খেলি।

অপর তিনজনে রাজী হইয়া শুধাইল—কি খেলা?

আমি প্রস্তাব করিলাম—চলো, এক কাজ করা যাক। আমরা চারজনে চোখ বাঁধিয়া চার দিকে চলিতে আরম্ভ করি। দেখা যাক, কে কতদূর যাইতে পারি এবং কে কোথায় গিয়া পড়ি।

যেমনি বলা, অমনি কাজ, কচি ঘাসের কি প্রেরণা! চারজনে রুমাল দিয়া চোখ বাঁধিয়া চলিতে শুরু করিলাম। ঘণ্টাখানেক চলিবার পরে আমার মনে হইল যেন একটি ঘরে প্রবেশ করিতেছি, এমন সময় একটা বস্তুতে হুঁচোট খাইয়া পড়িবার উপক্রম হইল। তাড়াতাড়ি চোখ খুলিয়া দেখিলাম যে, আমি সুবৃহৎ অট্টালিকার একটি কক্ষে ঢুকিয়া পড়িয়াছি। ঘরটায় অনেকগুলি বেঞ্চি ও একখানি মাত্র চেয়ার আছে। বুঝিলাম চেয়ারটায় আমি হুঁচোট খাইয়াছিলাম। পথশ্রমে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, চেয়ারখানায় বসিলাম। কতক্ষণ বসিয়াছিলাম মনে নাই, কারণ মাঝখানে একটু তন্দ্রার মতো আসিয়াছিল। হঠাৎ শুনিলাম একজন ভদ্রলোক (গাধা নয়, মানুষ) অপর একজনকে বলিতেছে—ও চেয়ারখানায় কে বসে? তখন সেই ভদ্রলোক (সেও মানুষ, গাধা নয়) একটু উঁকিঝুঁকি মারিয়া

আমাকে দেখিয়া বলিল—চিনতে পারলাম না। বোধ হয় যাঁর আসবার কথা ছিল তিনিই।

পূর্বোক্ত ভদ্রলোক বলিল—কে, নূতন শিক্ষক ?

অপব ভদ্রলোক উত্তর করিল—তাই বলেই মনে হচ্ছে।

তাহাদের কথাবার্তায় আমার তন্দ্রা ছুটিয়া যাওয়ায় বুঝিতে পাবিলাম যাহা শুনিলাম বাস্তব, স্বপ্ন নয়। আমি কিংকর্তব্য বুঝিতে না পারিয়া বসিয়াই রহিলাম। কিছুক্ষণে ঘণ্টাধ্বনি অনুসরণ করিয়া ছাত্রদল আসিয়া ঘরটা ভরিয়া ফেলিল। তাহারা সবিনয়ে আমাকে নমস্কার করিয়া বলিল—স্যর, পড়াতে আরম্ভ করুন।

এই বলিয়া আমার হাতে একখানা বই তুলিয়া দিল। নামটা দেখিলাম 'সবল নীতিশিক্ষা', বুঝিলাম নীতি শিক্ষাব পথ চিবকালই সরল।

এইবার বিষম সমস্যায় পড়িলাম। আমি গাধা। লেখাপড়া শিখি নাই, এমন কি মানুষের ভাষা অবধি আমার অজ্ঞাত, আমি পড়াইব কি ভাবে ? কিন্তু আত্মপরিচয় দিতে সাহস হইল না, যদি মার-ধোর করে, আবার একটু লজ্জাও যে না হইল এমন নহে। এহেন অবস্থায় আগাইব কি পিছাইব স্থির করিতে না পারিয়া সাহসে ভব করিয়া অগ্রসর হওয়াই সিদ্ধান্ত করিলাম। বইখানা চোখের সম্মুখে খুলিয়া ধরিয়া তারস্বরে গর্জন করিয়া গেলাম। থামিবা মাত্র দরজার অন্তরাল হইতে হেড মাস্টার মহাশয় আত্মপ্রকাশ করিয়া সোল্লাসে আমার করমর্দন করিয়া বলিলেন—আপনাকে অভিনন্দিত করছি—এমন গভীর জ্ঞান ও অধ্যাপনা-শক্তি ইতিপূর্বে আমার চোখে পড়েনি! তারপর কণ্ঠস্বর নিম্নতর ধাপে নামাইয়া বলিলেন—আপনার মতো লোক শিক্ষকবৃত্তি গ্রহণ করলে লোকে শিক্ষকদের আর গাধা বলতে সাহস করবে না।

অতঃপর তিনি ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন—ছাত্রগণ, নূতন শিক্ষক মহাশয়ের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করলে তোমরা মানুষ হতে পারবে।

আমার সন্দেহ দূর হইল। তবে ইহারা মানুষ নয়!

আমি ইস্কুল মাস্টারি করিয়া চলিলাম। ক্রমে পণ্ডিত বলিয়া আমার খ্যাতি রটিল। অবশেষে সেই খ্যাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যূহ ভেদ করিয়া কর্তৃপক্ষের কানে গিয়া প্রবেশ করিল। তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দানের জন্য আমাকে আহ্বান করিলেন। 'মানব ও পশুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ঐক্য' বিষয়ে আমি বক্তৃতা দিলাম। দেশের পণ্ডিত সমাজ মুগ্ধ হইয়া গেল, তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল যে মানব-জীবন ও পশু-জীবন উভয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকিলে এমন বক্তৃতা করা যায় না। তবু তাহারা আমাকে গাধা বলিয়া চিনিতে পারিল না। বরঞ্চ বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানজনক ডি. লিট. উপাধি দ্বারা আমাকে সংবর্ধিত করিলেন, আগেই বক্তৃতার পারিতোষিক বলিয়া মোটর খরচের বাবদ নগদ এক হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।

একদিন ইস্কুলে বসিয়া ছাত্রদিগকে পাঠ দিতেছি, এমন সময়ে ভয়ে আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। স্বয়ং রামু ধোপা ইস্কুল ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। শিক্ষকগণ রামুকে চিনিত, কারণ তাহারা সকলেই রামুর নিকটে বাকিতে কাপড় কাচাইয়া থাকে। হেড মাস্টার শুধাইলেন—কি রামু, খবর কি?

রামু বলিল—কর্তা, আমার গাধা এদিকে এসেছিল।

সেকেণ্ড মাস্টার হাসিয়া বলিল—ছাত্রদের মধ্যে খোঁজ করো।

একজন ছাত্র অনুচ্চস্বরে বলিল—মাস্টারদের মধ্যে খোঁজ করলেই পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

রামু আমাকে দেখিয়াও চিনিতে পারিল না। সে হতাশ হইয়া চলিয়া গেল। আমার আশঙ্কা দূরীভূত হইল। এখন আমি নির্বিবাদে মাস্টারি করিতেছি—প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর শিক্ষকতা করিবার পরে 'ভেটারেন' শিক্ষক বলিয়া আমার খ্যাতি রটিয়াছে, কত নোট বই লিখিয়াছি, ছ'খানা বাড়ি করিয়াছি, আগামী বৎসর নিখিল গৌড় শিক্ষক সম্মেলনের সভাপতি হইব বলিয়া ইতিমধ্যেই কানাঘুষা শোনা যাইতেছে। লোকে আমাকে সুখী মনে করে, আমি নিজেও অসুখী মনে করি না, তবু এক একবার মনে হয় যে এই নিত্য আবর্তিত নীরস শিক্ষক জীবনের চেয়ে রজকালয়ের গর্দভ জীবন ভালো ছিল। আহা সে কচি ঘাসের স্মৃতি কি ভুলিতে পারি? এখন আর কচি ঘাস খাইবার উপায় নাই—তৎপরিবর্তে কচি ছেলেদের মাথা খাইয়া থাকি। খাদ্য হিসাবে পূর্বোক্ত বস্তুটাই অধিকতর উপাদেয়!

যে তিন সাথীর সহিত অন্ধ-যাত্রায় বহির্গত হইয়াছিলাম পরে তাহাদের সন্ধান পাইয়াছি। তাহাদের গাধা বলিয়া লোকে চিনিতে পারে নাই—মানব সমাজে এখন তাহারা বিশিষ্ট নাগরিক। একজন সংবাদপত্রের সম্পাদক, আর একজন রাজনীতিক নেতা, তৃতীয়জন যুগান্তকারী সাহিত্যিক। আমরা চারজনে এখন দেশের চার দিক্‌পাল। মাঝে মাঝে চারজনে গড়ের মাঠে গিয়া মিলিত হই। কাছাকাছি লোক না থাকিলে কচি ঘাস ছিঁড়িয়া খাই, কোরাসে গান করি এবং 'সংসারে সর্বত্র গাধার জয়'—উচ্চৈস্বরে এই ধ্বনি তুলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকি।

পাঠক, সংক্ষেপে ইহাই আমার জীবনকথা। তুমি আমাকে চিনিতে পারিয়াছ কি না জানি না, কিন্তু তোমাকে চিনিতে আমার বাকি নাই।

চারজন মানুষ ও একখানা তক্তপোশ

একদিন বিকালবেলা এক সরাইখানায় চারজন পথিক আসিয়া পৌছিল। সরাইখানাব মালিক তাহাদের যথাসম্ভব আদর-অভ্যর্থনা কবিয়া বসাইল। পথিকরা অনেক দূব হইতে আসিতেছে, পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত, গত বাত্রি তাহাদের সকলেরই বৃক্ষতলে কাটিয়াছে, আজ সরাইখানায বিশ্রাম ও আহার করিতে পারিবে আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহাবা একটি কক্ষে বসিয়া আহার কবিয়া লইল এবং তাবপবে পরস্পবেব পরিচয় লইতে লাগিল। তাহাদের কেহ কাহাকেও চিনিত না—এই তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ।

প্রথম পথিক বলিল যে, সে একজন শিক্ষক। এখন বিদ্যালয়ের ছুটি, তাই সে তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াছিল। হিমালয়ের পাদদেশে পশুপতিনাথের পীঠস্থান। কয়েকজন সঙ্গীব সাথে সে সেখানে গিয়াছিল। দেবদর্শন সারিয়া ফিরিবার পথে তাহারা পথ হারাইয়া এক বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। রাত্রে তাহারা এক গাছের তলায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। ভোরবেলা যখন সে জাগিল, দেখিল যে তাহার সঙ্গীরা নাই, তৎপরিবর্তে তাহাদের কঙ্কাল কয়খানা পড়িয়া আছে। বোধ হয় কোন শ্বাপদে খাইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে একা বাঁচিল কিরূপে? তখন তাহার মনে পড়িল সে যে শিক্ষক, সে যে জাতিগঠনের রাজমিস্ত্রী—শ্বাপদ বোধ হয় সেই খাতিরেই তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। যদি এ শ্বাপদটা তাহার ভূতপূর্ব ছাত্র হইত, তবে কি আর তাহার রক্ষা ছিল? কিংবা এমনও হইতে পারে যে, হাজার হাজার ছাত্র শাসাইয়া এমন শক্তি সে অর্জন করিয়াছে—সামান্য

শ্বাপদে তাহার কি করিবে? যাই হোক, আর যে-কারণেই হোক, সে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। সারা দিন চলিবার পরে সে এই সরাইখানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সংক্ষেপে ইহাই তাহার পরিচয়।

তখন দ্বিতীয় পথিক আরম্ভ করিল। সে বলিল যে, সে একজন সাহিত্যিক। গোরক্ষপুরে সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় সেখানে সে গিয়াছিল। একটি বৃহৎ অট্টালিকায় যখন মহতী সভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে এমন সময়ে এক কালান্তক ভূমিকম্প শুরু হইল। ফলে অট্টালিকার ছাদখানি পড়িয়া সকলেই মারা গেল—কেবল সে অক্ষতদেহে রক্ষা পাইয়াছে।

তাহার শ্রোতারা বিস্ময়ে বলিল—তাহা কিরূপে সম্ভব?

সাহিত্যিক বলিল—আপনারা জানেন না, আর জানিবেনই বা কিরূপে, আপনারা তো সাহিত্যিক নহেন, সাহিত্যিকদের মাথা বড় শক্ত। হেন ছাদ নাই—খসিয়া পড়িয়া যাহা তাহাদের মাথা ফাটাইতে সমর্থ, হেন ভূমিকম্প নাই—যাহাতে তাহারা টলে, হেন অগ্নিকাণ্ড নাই—যাহাতে তাহারা পোড়ে।

শিক্ষক বলিল—তবে অন্য সবাই মরিল কেন?

সাহিত্যিক বলিল—সে মহতী সাহিত্য সভায় আমিই ছিলাম একমাত্র সাহিত্যিক। ইহা শুনিয়া আপনারা বিস্মিত হইতেছেন—কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিয়া রাখুন সাহিত্য সভায় পারতপক্ষে সাহিত্যিকরা কখনো যায় না—এক সভাপতি ব্যতীত। তাই তাহারা পিষিয়া মারা গেল আর আমি যে শুধু বাঁচিয়া রহিলাম তা ই নয়, আমার মাথায় লাগিয়া একখানা পাথরের টুকরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধূলি হইয়া গেল। এই সেই ধূলি।

এই বলিয়া সে পকেট হইতে এক কৌটা ধূলি বাহির করিয়া দেখাইল। তারপরে বলিল—সাহিত্যিকদের বেলায় শিরোধূলি

কথাটাই অধিকতর প্রযোজ্য। তারপরে গোরক্ষপুর হইতে বাহির হইয়া পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়াছি। ইহাই আমার পরিচয়।

তৃতীয় পথিক বলিল—মহাশয়, আমি একজন চিকিৎসক। হজরতপুরে মহামারী দেখা দিয়াছে শুনিয়া সেখানে আমি গিয়াছিলাম। সেখানে কোন চিকিৎসক ছিল না। আমি সেখানে গিয়া নিজেকে বিজ্ঞাপিত করিবামাত্র হজরতপুরের সমস্ত অধিবাসী নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। তাহারা যাইবার সময়ে বলিয়া গেল যে মহামারীর হাতে যদি বা বাঁচি—মহাবৈদ্যের হাত হইতে রক্ষা করিবে কে?

নগরের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে এক অতি কুৎসিত ও বীভৎস বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া বলিলাম—তুমি পালাও নাই কেন?

সে বলিল—আমার ভয়েই তো সকলে পালাইতেছে, আমি পালাইতে যাইব কেন? আমার নাম মহামারী। আমি তাহাকে বলিলাম যে, তোমার গর্ব বৃথা, সকলে আমার ভয়েই পালাইয়াছে, আমার নাম মহাবৈদ্য। ইহা শুনিবামাত্র সে প্রাণভয়ে পলায়ন শুরু করিল। কিছুকাল পরে দেখি হজরতপুরের নাগরিকগণ মহামারীর সঙ্গে সন্ধি করিয়া আমার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা বলিল—মহামারী আমাদের শত্রু নয়, মিত্র; যেহেতু তাহার কৃপাতেই আমরা অক্ষয়স্বর্গ লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়া থাকি। তাহাদের সম্মিলিত শক্তির সম্মুখে আমি দাঁড়াইতে না পারিয়া পরম ভাগবত ইংরেজ সৈন্যের মতো দৃঢ়-পরিকল্পনানুযায়ী পশ্চাদপসরণ করিতে করিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। বন্ধুগণ, ইহাই আমার ইতিহাস।

তখন চতুর্থ পথিকের পরিচয় দিবার পালা।

সে আরম্ভ করিল—মহাশয়, আমি গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলাম। সারা দিন উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যায় যখন স্নান করিতে নামিব এমন সময়ে শুনিতে পাইলাম কে যেন বলিতেছে—বৎস, তুমি যথেষ্ট পুণ্য সঞ্চয়

করিয়াছ—এখন স্নান করো, করিবামাত্র তোমার মুক্তি হইয়া যাইবে, আর তোমাকে পৃথিবীতে বাস করিতে হইবে না।

সে বলিল—মহাশয়, মুক্তি কাম্য ইহা জানিতাম, কিন্তু কখনো সদ্য মুক্তির সম্ভাবনা ঘটে নাই।

আমি বিষম ভীত হইয়া পড়িলাম এবং গঙ্গাস্নান না করিয়াই পলায়ন করিলাম। রাত্রে পথ ভুলিয়া কোথা হইতে যে কোথায় গেলাম জানি না—তারপরে ঘুরিতে ঘুরিতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

তাহার কাহিনী শুনিয়া অপর তিন পথিক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনার পরিচয় কি?

ইহা শুনিয়া চতুর্থ পথিক বলিল—আমি একজন চলচ্চিত্র অভিনেতা—যাহার বাংলা 'সিনেমা স্টার'।

তখন সকলে একবাক্যে স্বীকার করিল—তাহার অভিজ্ঞতাই সব চেয়ে বিস্ময়কর—তবে সিনেমা স্টারের পক্ষে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

এই ভাবে পরস্পরের পরিচয় সাধনের পালা উদ্‌যাপিত হইলে চারজনে মিলিয়া গল্পগুজব আরম্ভ করিল; চারজনেই আশা করিল যে, রাতটা আমোদ-আহ্লাদে ও আরামে কাটাইতে পারিবে। এমন সময়ে সরাইখানার মালিক প্রবেশ করিল। সে অতিথিদিগকে বিশেষ আপ্যায়ন করিয়া সেখানে যতদিন খুশি কাটাইতে অনুরোধ করিল, বলিল—তাহাদের যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে সে দৃষ্টি রাখিবে। তারপরে কি যেন মনে পড়াতে সে একটু হাসিয়া বলিল—এই সরাইখানার সমস্ত ঘরই অধিকৃত—কেবল একটিমাত্র ঘর খালি আছে।

পথিকরা বলিল—একটি ঘরেই আমাদের চলিবে।

সরাইখানার মালিক বলিল—ঘরটি নীচের তলাতে কাজেই একটু স্যাঁৎসেতে।

পথিকরা বলিল—তাহাতেই বা ক্ষতি কি? ঘরে তক্তপোশ আছে তো?

মালিক বলিল—তক্তপোশ অবশ্যই আছে—কিন্তু একখানা মাত্র, কাজেই আপনাদের তিনজনকে মেঝেতে শুইতে হইবে, সেই জন্যই স্যাঁৎসেতে মেঝের উল্লেখ করিয়াছিলাম। ইহা ছাড়া আর কোন অসুবিধা নাই। আপনাদের মধ্যে কে তক্তপোশে শুইবেন তাহা আপনারা স্থির করিয়া ফেলুন, আমি আর কি বলিব?

এই বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

তখন পথিক চারজন বিব্রত হইয়া পড়িল। কে বা তক্তপোশে শুইবে আর কাহারা বা মেঝেতে শুইবে! তাহারা সেই ঘরটায় গিয়া দেখিল সরাইখানার মালিকের কথাই সত্য। ঘরের মেঝে বিষম ভেজা, তার উপরে আবার এখানে সেখানে গর্ত, ইতস্ততঃ আরশুলা, ইঁদুর, ছুঁচো নির্ভয়ে পরিভ্রমণশীল, এক কোণে আবার একটা সাপের খোলসও পড়িয়া আছে। আর এক দিকে একজনের মাপের একখানা তক্তপোশ—সেটাও আবার অত্যন্ত জীর্ণ।

চারজনে গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল—তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া ছুঁচোগুলা চিক্-চিক্ শব্দে পলায়ন করিল—যেন ফিক্-ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কে তক্তপোশে শুইবে? কাহার শরীর খারাপ? চারজনেরই শরীরের অবস্থা সমান।

তখন শিক্ষক বলিয়া উঠিল—এক কাজ করা যাক। আমাদের মধ্যে যাহার জীবন সমাজের পক্ষে সবচেয়ে দরকারী—সে-ই তক্তপোশে শয়ন করিবে, অপর তিনজনকে মেঝেতে শুইতে হইবে।

ইহা শুনিয়া তিনজনে ত্রিগপৎ বলিয়া উঠিল—ইহা অত্যন্ত সমীচীন—আর ইহা শিক্ষকের যোগ্য কথা বটে। কিন্তু কাহার জীবন

সমাজের পক্ষে সবচেয়ে দরকারী তাহা কেমন করিয়া বোঝা যাইবে? পরীক্ষার উপায় কি?

তখন সাহিত্যিক বলিল—আমি একটা উপায় নির্দেশ করিতে পারি। আসিবার সময়ে দেখিয়া আসিয়াছি কাছেই একটা গ্রাম আছে। সেখানে আমাদের কেহ চেনে না। আমরা চারজন চার পথে সেই গ্রামে প্রবেশ করিব। নিজেদের অত্যন্ত বিপন্ন বলিয়া পরিচয় দিব—ইহার ফলে গ্রামের লোকদের কাছে যে সবচেয়ে বেশি সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবে—বুঝিতে পারা যাইবে তাহারই জীবনেব মূল্য সর্বাধিক। তক্তপোশে শয়ন করিবার অধিকার তাহারই।

সাহিত্যিকের উদ্ভাবনী শক্তি দেখিয়া তিনজনে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

তখন চিকিৎসক বলিল—তবে আর বিলম্ব করিয়া কাজ কি? এখনো অনেকটা বেলা আছে—এখনি বাহির হইয়া পড়া যাক, রাত্রি প্রথম প্রহরের মধ্যেই ফিরিতে হইবে।

সিনেমা স্টার বলিল—আশা করি, আমরা সকলেই ফিরিয়া আসিয়া নিজেদের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সত্য কথা বলিব।

ইহা শুনিয়া শিক্ষক বলিয়া উঠিল—হায় হায়, যদি মিথ্যা কথাই বলিতে পারিব, তবে আজ কি আমার এমন দুর্দশা হইত!

তখন সকলে পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রামেব দিকে বিভিন্ন পথে প্রস্থান করিল।

২

রাত্রি প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই চার বন্ধু ফিরিয়া আসিল। সকলে একটু বিশ্রাম করিয়া লইয়া সগুলব্ধ অভিজ্ঞতার ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া নিজের নিজেব পরিভ্রমণ-কাহিনী বলিতে শুরু করিল।

প্রথমে শিক্ষক বলিতে আরম্ভ করিল। সে বলিল—আমি উত্তর দিকের পথ দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলাম। কিছুদূর গিয়া একটি সম্পন্ন গৃহস্থ-বাড়ি দেখিলাম—ভাবিলাম এখানেই আমার ভাগ্য পরীক্ষা করিব। বাড়ির দরজায় উপস্থিত হইবামাত্র সেই দয়ালু গৃহস্থ আমাকে বসিবার জন্য একটি মোড়া আগাইয়া দিল। আমি তাহাকে নমস্কার করিয়া উপবেশন করিলাম। সদাশয় গৃহস্থ আমাকে আপ্যায়িত করিয়া আমার পরিচয় শুধাইল। আমি বলিলাম যে, আমি একজন বিদেশী শিক্ষক—পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছি।

ইহা শুনিবামাত্র গৃহস্থ চাকরকে ডাকিয়া বলিল—ওরে রামা, মোড়াটা ঘরে তুলিয়া রাখ, বাহিরে থাকিলে নষ্ট হইয়া যাইবে। আমি পরিত্যক্ত-মোড়া হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বলিলাম—আজ আপনার বাড়িতে রাত্রি কাটাইবার অনুমতি প্রার্থনা করি। ইহা শুনিয়া গৃহস্থ বলিল—তোমাকে যে আশ্রয় দিব তাহার স্থানাভাব। আমি বলিলাম যে, অন্য জায়গা যদি না থাকে, তবে অন্ততঃ আপনার গোয়াল ঘরে নিশ্চয় স্থান হইবে। ইহা শুনিয়া গৃহস্থ বলিল—গোয়াল ঘরেই বা স্থান কোথায়? দশ-বারোটা গোরু আছে। কোনটাকে বাহিরে রাখিতে সাহস হয় না—রাত্রে বড় বাঘের ভয়। আজকাল গোরুর যা দাম জানো তো?

আমি কহিলাম—গোরুর চেয়ে শিক্ষকের জীবনের মূল্য কম?

সে বলিল—কি যে বলো? একটা যেমন তেমন গোরুও আজকাল পাঁচশো টাকার কমে মেলে না? আর দশ টাকা হইলেই একটা শিক্ষক মেলে। এখন তুমিই বিচার করিয়া দেখো।

আমি বলিলাম—কিন্তু আমরা যে জাতিগঠন করি।

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল—তার মানে তোমরা গোরু চরাও। কিন্তু রাখালের চেয়ে গোরুর মূল্য অনেক বেশি।

আমি বলিলাম—আপনার ছেলে নিশ্চয় শিক্ষকের কাছে পড়ে।

সে বলিল—পড়িত, এখন পড়ে না। এক সময়ে তাহার জন্য একজন শিক্ষক রাখিয়াছিলাম। সে এখন আমার গোরুর রাখালী করে—কারণ সে দেখিয়াছে যে, শিক্ষকের চেয়ে রাখালের বেতন ও সম্মান অনেক বেশি। তবে তুমি যদি রাখালী করিতে চাও, আমি রাখিতে পারি—আমার আর একজন রাখালের আবশ্যক। আর তোমাকে একটা পরামর্শ দিই, গোরুই যদি চরাইবে তবে এমন গোরু চরাও যাহারা দুধ দেয়। দুধ দেয় না এমন মানুষ-গোরু চরাইয়া কি লাভ? যাই হোক, তোমার ভালোমন্দ তুমি বুঝিবে—তবে বাপু, এখানে তোমার জায়গা হইবে না।—ইহা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে শিক্ষকের জীবনের কি মূল্য। সেখান হইতে সোজা সরাইখানায় ফিরিয়া আসিলাম।—এই বলিয়া সে নীরব হইল।

তখন চিকিৎসক তাহার কাহিনী আরম্ভ করিল। সে বলিল—দক্ষিণ দিকের পথ দিয়া আমি গ্রামে প্রবেশ করিয়া একটি অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম। অনুমানে বুঝিলাম বাড়িটি কোন ধনীর—কিন্তু বাড়ির মধ্যে ও আশেপাশে লোকজনের উদ্বিগ্ন চলাচল দেখিয়া কেমন যেন সন্দেহ উপস্থিত হইল। এমন সময়ে এক ব্যক্তি বাহিরে আসিতেছিল, তাহাকে শুধাইলাম—মশায়, ব্যাপার কি? এ বাড়িতে আজ কিসের উদ্বেগ?

সে বলিল—আপনি নিশ্চয় বিদেশী, নতুবা নিশ্চয় জানিতেন। তবে শুনুন, এই বলিয়া সে আরম্ভ করিল—এই বাড়ি গ্রামের জমিদারের। তাঁহার একমাত্র পুত্র মৃত্যুশয্যায়—এখন শেষ মুহূর্ত সমাগত—যাহাকে সাধারণ ভাষায় বলা হইয়া থাকে যমে মানুষে টানাটানি—তাহাই চলিতেছে। বোধ করি যমেরই জয় হইবে।

আমি বলিলাম—এ রকম ক্ষেত্রে যমেরই প্রায় জয় হইয়া থাকে—

তার কারণ চিকিৎসক আসিয়া যোগ দিতেই যমের টান প্রবলতর হইয়া ওঠে ; ইহার প্রমাণ দেখিতে পাইবেন যে চিকিৎসক আসিয়া না পৌঁছানো পর্যন্ত রোগী প্রায়ই মরে না। কিন্তু তারপরেই কঠিন।

সে লোকটি বিস্মিত হইয়া কহিল—এ তথ্য আপনি জানিলেন কি করিয়া ?

আমি সগর্বে বলিলাম—আমি যে একজন চিকিৎসক।

তখন সে বলিল—আপনার ভাগ্য ভালো, এ গ্রামের চিকিৎসকেরা কেহই রোগীকে নিরাময় করিতে পাবে নাই—আপনি গিয়া চেষ্টা করিয়া দেখুন। সফল হইলে প্রচুর ধনরত্ন লাভ করিবেন।

আমি ভাবিলাম, সত্যই আমার ভাগ্য ভালো। একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক। সফল হইলে আর সরাইখানার ভাঙা তক্তপোশে রাত্রি না কাটাইয়া জমিদার-বাড়িতেই আদবে বাত্রি যাপন করিতে পারিব।

তখন আমি ভিতরে গিয়া নিজেকে চিকিৎসক বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিয়া রোগী দেখিতে চাহিলাম। আমাকে চিকিৎসক জানিতে পারিয়া জমিদারের নায়েব সসম্ভ্রমে বসিতে দিল। সম্যক্ পরিচয় পাইয়া বলিল—হ্যাঁ, রোগীর অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক। তবে আপনি যদি তাহাকে আরোগ্য করিতে পাবেন তবে দশ হাজার মুদ্রা ও সরিফপুর পরগনা পাইবেন। আমি উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। তখন নায়েবের আদেশে একজন ভৃত্য আমাকে ভিতর মহলে লইয়া চলিল। পথে অনেকগুলি ছোট বড় কক্ষ পার হইয়া যাইতে হয়—একটি প্রায়ান্ধকার কক্ষে পাশাপাশি তিন-চারটি লোক কাপড় মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে দেখিতে পাইলাম। চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ইহারা এমন অসময়ে ঘুমাইতেছে কেন ?

চাকরটি বলিল—অসময় তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহাদের এ ঘুম আর ভাঙিবে না।

—সে কি? ইহারা কে?

—ইহারা মৃত এবং মৃত চিকিৎসক।

—মরিল কেমন করিয়া?

—চিকিৎসা করিতে গিয়া।

—চিকিৎসায় তো রোগী মরে।

—কখনো কখনো চিকিৎসকও মরে—প্রমাণ সম্মুখেই।

এই সব বাক্য বিনিময়ে আমার চিত্ত উচাটন হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম—ব্যাপার কি খুলিয়া বলো।

সে বলিল—বুঝাইবার বিশেষ আবশ্যক আছে কি? হয়ত জীবন দিয়াই আপনাকে বুঝিতে হইবে। জমিদারবাবু বড়ই প্রচণ্ডস্বভাবের লোক। আরোগ্য করিতে পারিলে তিনি চিকিৎসককে প্রচুর ধনরত্ন দিবেন ইহা যেমন সত্য, তেমনি চিকিৎসক ব্যর্থকাম হইলে তাহাকে মারিয়া ফেলিবেন ইহাও তেমনি সত্য —প্রমাণ তো নিজেই দেখিলেন।

—আগে আমাকে এ কথা বলা হয় নাই কেন?

—তাহা হইলে কি আর আপনি চেষ্টা করিতে অগ্রসর হইতেন?

—কিন্তু চিকিৎসক মারিয়া ফেলার ইতিহাস তো কখনো শুনি নাই।

—জমিদারবাবুর ধারণা আনাড়ি চিকিৎসক যমের দূত। তাহাদের মারিয়া ফেলিলে যমের পক্ষকে দুর্বল করিয়া রোগীর সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। কই আসুন—

আমি ততক্ষণে জানালার শিক ভাঙিয়া, পগার ডিঙাইয়া ছুটিয়াছি—আমাকে ধরিবে কে? যদিচ পিছনে আট-দশটি পাইক-পেয়াদা দৌড়াইয়াছে দেখিতে পাইলাম। এক ছুটে সরাইখানায়

আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এই পর্যন্ত বলিয়া সে থামিল; তারপরে বলিল—আজ আমাকে এই স্যাঁৎসেতে মেঝেতেই শুইতে হইবে, তা হোক। আমের কাঠের চেয়ে এই ভেজা মেঝে অনেক ভালো।

এবার সাহিত্যিকের পালা। সে বলিল—আর কি বলিব! খুব বাঁচিয়া গিয়াছি—বন্ধু চিকিৎসকের মতো আমিও মৃত্যুর খিড়কি দরজার কাছে গিয়া পড়িয়াছিলাম—নেহাত পরমায়ুর জোরেই এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছি।

সকলে উৎসুক হইয়া শুধাইল—ব্যাপার কি খুলিয়া বলুন।

সাহিত্যিক বলিয়া চলিল—পূর্বদিকের পথ দিয়া গ্রামে গিয়া তো প্রবেশ করিলাম। সে দিকটা রজকপল্লী। রজকপল্লী দেখিলেই আমার রজকিনী রামীকে মনে পড়িয়া যায়, কোন্ সাহিত্যিকের না যায়? রজক কিশোরীদের লক্ষ্য করিতে করিতে চলিয়াছি—হ্যাঁ—চণ্ডীদাস রসিক ছিল বটে, সজোরে পাথরের উপরে কাপড় আছড়াইবার ফলে তুই বাহু ও সংলগ্ন কোন কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমন সুপুষ্ট হইয়া উঠে যে, অপরের প্রশস্ত নীল শাড়িও তাহা আবৃত করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বিশেষ কাপড় আছড়াইবার সময়ে উক্ত প্রত্যঙ্গদ্বয় শরীরের তালে তালে শূন্যে বৃথা মাথা কুটিয়া মরিতে থাকে তাহা দেখিয়া কোন্ পুরুষের মন না ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে—সাহিত্যিকদের তো কথাই নাই। এমন সময়ে একটি রজক কিশোরী আমাকে দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—ফিরিয়াছে, ফিরিয়াছে।

ফিরিয়াছে? কে ফিরিয়াছে? হ্যাঁ, ফিরিয়াছে বই কি? আমার মধ্যে দিয়া চিরদিনকার চণ্ডীদাস ফিরিয়া আসিয়াছে, রজকিনী রামীর শীতল পায়ে। বুঝিলাম জগতে তুটি মাত্র প্রাণী আছে—আমি চণ্ডীদাস; আর কিশোরী রজকিনী রামী। দেখিতে দেখিতে আমার চারিদিকে একদল কিশোরী জুটিয়া গেল—জগৎ রামীময়, আর

তাহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইল জগৎ আমিময়। এ রকম অবস্থায় কবিতা না লিখিয়া উপায় কি?

একজন বলিল—ফিরিয়াছে।

(ফিরিয়াছে বই কি! না ফিরিয়া কি উপায় আছে?)

আর একজন বলিল—অনেকদিন পরে।

(সত্যিই তো! চণ্ডীদাসের পরে আজ কত যুগ গিয়াছে!)

তৃতীয়া বলিল—ঠিক সেই চেহারা, ঠিক সেই হাবভাব।

(এমন তো হইবেই। মানুষ বদলায়, প্রেমিক কবে বদলিয়াছে?)

চতুর্থী বলিল—কেবল যেন একটু রোগা মনে হয়।

(ওগো শুধু মনে হওয়া নয়—এ যে অনিবার্য বিরহসঞ্জাত-কৃশতা।)

পঞ্চমী কিছু বলিল না—কেবল আমাব গায়ে হাত বুলাইয়া দিল।

(ওগো বৈষ্ণব কবি, তুমি প্রশ্ন কবিয়াছিলে অঙ্গের পরশে কিবা হয়। আজ আমারও ঠিক সেই প্রশ্ন।)

অপরা বলিল—কিন্তু লেজটা যেন কাটিয়া দিয়াছে?

লেজ? কাব লেজ? এবাব চণ্ডীদাস-থিওরিতে সন্দেহ জন্মিল।

এবারে আমি প্রথম কথা বলিলাম—আমি প্রেমিক চণ্ডীদাস।

তাহারা সমস্বরে বলিল—হ্যাঁগো, হ্যাঁ, তাহার ঐ নামই ছিল বটে।

এই বলিয়া একজন একটা কাপড়ের মোট আনিয়া আমার ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে চেষ্টা করিল।

আমি বলিলাম—আমি তো চাকর নই।

তাহারা বলিল—চাকর হইতে যাইবে কেন? তুমি যে গাধা।

আমি গাধা!

বলিলাম—সে কি? আমি যে মানুষের মতো কথা বলিতে পারি।

রসিকা বলিল—অনেক মানুষ গাধার মতো কথা বলে, একটা গাধা না হয় মানুষের মতো কথাই বলিল—আশ্চর্যটা কি?

আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—আরে, আরে, আমি যে সাহিত্যিক!

—তবে আর তোমার রাসভত্বে সন্দেহ নাই—কারণ যাহারা মধুর স্বাদ নিজে গ্রহণ না করিয়া কবিতার ব্যাখ্যা করিয়া মবে—তাহারা যদি গাধা না তবে গাধা কে?

তখন অপব এক কিশোবী বলিল—ও দিদি, এ যে বশ মানিতে চায় না—কি করি?

কিশোরীব দিদি যুবতী বলিল—প্রেমের ডুরিখানা আন তো!

প্রেমেব ডুবি শুনিলেও দেহে রোমাঞ্চ হয়।

দেখিতে পাইলাম একজন মোটা একটি কাছি আনিতেছে।

তবে ওবই নাম প্রেমের ডুরি। ও ডোর ছিঁড়িবার সাধ্য তো আমাব হইবেই না—এমন কি পাড়াসুদ্ধ লোকের হইবে না। তখনই ছুট। কিশোরীরা দৌড়ায় বেশ! প্রায় ধরিয়াছিল আব কি! উঃ, পথ বিপথ লক্ষ্য করি নাই—এই দেখুন হাঁটুব কাছে ছড়িয়া গিয়াছে, কাপড়টা ছিঁড়িয়া গিয়াছে! তবু ভালো যে প্রেমেব ডুবিতে বদ্ধ হই নাই।

এই বলিযা সে থামিল; তার পবে বলিল—তবু ভালো যে আজ ভিজা মেজেতে শুইতে পাইব, প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়িলে গোয়ালে ঘুমাইতে হইত।

তাহার কাহিনী শেষ হইলে সকলে মিলিয়া সিনেমা স্টারের অভিজ্ঞতা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

চতুর্থ পথিক তাহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে শুরু করিল।

বন্ধুগণ, আমি পশ্চিম দিকের পথ দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখি একটি পুকুরের ধারে একটি মেলা বসিয়াছে। স্থান কাল পাত্র দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে আমার জীবনের মূল্য বিচারের ইহাই যথার্থ স্থান। আমি তখন পুকুরের জলে নামিয়া ডুবিয়া

মরিতে চেষ্টা করিলাম। আপনারা ভয় পাইবেন না, সহস্রবার ডুবিয়াও কি করিয়া না মরিতে হয় তাহার কৌশল আমাদের আয়ত্ত। ডুবিয়া মরিবার চেষ্টা অভিনয় মাত্র। আমি সকলকে ডাকিয়া বলিলাম —আমি ডুবিয়া মরিতেছি, তোমরা আমাকে বাঁচাও! আমার আর্ত আহ্বান শুনিয়া সকলে পুকুরের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কেহ জলে নামিল না।

আমি বলিলাম—আমি ডুবিলাম বলিয়া—শীঘ্র বাঁচাও।

তাহারা বলিল—আগে তোমার পরিচয় দাও, তবে জলে নামিব।

আমি বলিলাম—আমি একজন মানুষ। বাঁচাইবার পক্ষে ইহাই কি যথেষ্ট নয়?

তাহারা বলিল—আমরা সবাই তো মানুষ। কেবল আইনে বাধে বলিয়া পরস্পরকে মারিয়া ফেলিতে পারিতেছি না—সদয় বিধাতা আইনের নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া তোমাকে যখন মারিবার ব্যবস্থাই করিয়াছেন, তখন তোমাকে আমরা বাঁচাইতে যাইব কেন?

আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বলিলাম—আমি শিক্ষক।

তাহারা একবাক্যে বলিল—জীবন্মৃত হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার চেয়ে তোমার ডুবিয়া মরাই ভালো।

আমি বলিলাম—আমি চিকিৎসক।

তাহারা বলিল—অনেক মারিয়াছ, এবারে মরো।

—আমি সাহিত্যিক।

—ডুবাইতে পারো আর ডুবিতে পারো না?

—আমি সাংবাদিক—শুনিয়া তাহারা ঢেলা মারিল।

—আমি সাধুপুরুষ—শুনিয়া তাহারা হাসিল।

—আমি বৈজ্ঞানিক—শুনিয়া তাহারা সাড়াশব্দ করিল না।

--আমি গায়ক—শুনিয়া কেহ কেহ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

—আমি খেলোয়াড়—শুনিয়া দু-একজন জলে নামিতে উদ্যত হইল।

—আমি চলচ্চিত্র অভিনেতা।

তাহারা বুঝিতে পারিল না। তখন বলিলাম—যাহার বাংলা হইতেছে 'সিনেমা স্টার'।

ইহা শুনিবা মাত্র মেলার সমস্ত জনতা একসঙ্গে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। পুকুরের জল স্ফীত হইয়া উঠিয়া মেলার জিনিসপত্র ভাসাইয়া লইয়া গেল।

সকলেরই মুখে—হায় হায়! গেল গেল! দেশ ডোবে, জাতি ডোবে, সমাজ ডোবে, রাজ্য সাম্রাজ্য সভ্যতা আদর্শ ডোবে তাহাতে ক্ষতি নাই—কেবল সিনেমা স্টার ডুবিলে সমস্ত গেল! হায়, হায়! গেল, গেল!

সকলে মিলিয়া আমাকে টানিটা তুলিয়া ফেলিল। সকলে অর্থাৎ আবাল-বৃদ্ধ নর-নারী যুবক-যুবতী বালক-বালিকা কিশোর এবং কিশোরী।

আমাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া আমার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপ-জোক লইতে আরম্ভ করিয়া দিল। পা হইতে মাথা পর্যন্ত নানা স্থানের মাপ। তারপরে চুলের রং, ঠোঁটের রং, নখের রং, দাঁতের রং, চোখের রং। এ সব টোকা হইয়া গেলে আমার জীবনেতিহাসের খুঁটিনাটি লইয়া প্রশ্ন শুরু করিল। আমাকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। আগামী কল্য তাহাদের সংবর্ধনা গ্রহণ করিব এই প্রতিশ্রুতি দিয়া তবে ছাড়া পাইয়া আসিয়াছি।

চতুর্থ পথিকের অভিজ্ঞতা শুনিয়া অপর তিনজনে বুঝিতে পারিল আজ রাত্রে তক্তপোশে শুইবার অধিকার কাহার।

চার বন্ধুতে আহারান্তে শয়ন করিল। সিনেমা স্টার তক্তপোশে শুইল—অপর তিনজনে সেই ভেজা মেঝের উপরে।

তক্তপোশশায়ী সিনেমা স্টারের নিদ্রার তালে তালে যখন নাসিকা গর্জন চলিতেছিল, তখন তিনজনে মশা, মাছি, ছুঁচো, ইঁদুর প্রভৃতি তাড়াইয়া বিনিদ্র-নিদ্রায় রাত্রি কাটাইতেছিল। সারারাত ছুঁচোগুলো চিক্-চিক্ করিয়া ঘরময় দৌড়িয়া বেড়াইল—তিনজনের কানে তাহা বিদ্রূপের ফিক্-ফিক্ হাসির মতো বোধ হইল। ঘরের একপ্রান্তে একটা সাাপর খোলস পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও তাহারা নির্বিঘ্নে রাত্রি অতিবাহিত করিল! কপালে যাহাদের দুঃখ সাপেও তাহাদের স্পর্শ করে না।

চাকরিস্তান

সমাগত অতিথিদিগের অভ্যর্থনা শেষ করিয়া সিন্ধবাদ তাহার নবম বারের সমুদ্রযাত্রার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল।

সিন্ধবাদ বলিল—বন্ধুগণ, ইতঃপূর্বে আমার আট বারের সমুদ্রযাত্রাব কাহিনী বলিয়াছি, এবারে যাহা বলিব তাহা সব চেয়ে বিস্ময়জনক। আমি একটা কথাও বানাইয়া বলিব না, দরকারও নাই, কারণ বাস্তব ঘটনাই এমন বিস্ময়কর যে আপনাদের সন্দেহ হইতে পারে আমি অনেকবার সমুদ্রের হাওয়া খাইয়া হয়তো বা সাহিত্যিক হইয়া উঠিয়াছি।

আমি বছর দুই পূর্বে বসোরা বন্দরে দুইখানি জাহাজে নানা পণ্যদ্রব্য বোঝাই করিয়া বাণিজ্যের জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রথমে কিছুদিন আমরা দক্ষিণ দিকে চলিলাম, অবশেষে নারিকেল-পূর্ণ একটি দ্বীপকে বামে রাখিয়া আমাদের জাহাজ পূর্বোত্তরে চলিতে লাগিল। এই ভাবে প্রায় একমাস গেল।

এমন সময়ে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আকাশ মেঘে ঢাকিয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিষম ঝড় উঠিল। ঝড় ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিল। জাহাজের প্রধান নাবিক বলিল যে সে প্রায় ত্রিশ বৎসর জাহাজ চালাইয়া আসিতেছে, কিন্তু এমন দানবীয় ঝড় জীবনে আর দেখে নাই। আমরা সকলেই প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়া হতাশভাবে ভগবানের নাম জপ করিতে লাগিলাম।

এমন সময়ে একটা ভীষণ দমকা আসিয়া আমাদের জাহাজের ঝুঁটি ধরিয়া এমন নাড়িয়া দিল যে, মুহূর্তে জাহাজখানা শত খণ্ড

হইয়া ডুবিয়া গেল। আমি ফুটন্ত কালো জলের মধ্যে কোথায় তলাইয়া গেলাম।

যখন জ্ঞান হইল দেখিলাম সমুদ্রের ধারে বালুর উপরে আমি পড়িয়া আছি। চাহিয়া দেখি সমুদ্র শান্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অপব জাহাজখানার কোন চিহ্ন কোথাও নাই। আমার সঙ্গীদের কি দশা হইল দেখিবার জন্য আমি চারিদিকে খুঁজিতে লাগিলাম, কত ঘুবিলাম, কত নাম ধরিয়া ডাকিলাম, কত ইসারা করিলাম, কিন্তু কেহ যে বাঁচিয়া আছে এমন বোধ হইল না।

সঙ্গীদের আশা ছাড়িয়া দিতেই নিজের কথা স্মরণ হইল। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তিতে আমি মৃতপ্রায় ; পরিধানে একমাত্র বস্ত্র। তখন মনে হইল এ কোথায় আসিয়া পড়িলাম ! নিরন্ন নিঃসহায় হইয়া বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি ? মনে হইল সঙ্গীদের-ই ভাগ্য ভালো—আমাব মতো এমন দীর্ঘায়িত যন্ত্রণা ভোগ তাহাদের করিতে হইবে না। ভাবিলাম এখানে তো জনপ্রাণী দেখিতেছি না—আর দেখিলেই বা লাভ কি, তাহারা কি আমার মতো বিদেশীকে সাহায্য কবিবে ? কিংবা হয়তো অসভ্যদের দেশে আসিয়া পড়িয়াছি—তাহারা আমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে ! অবশেষে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া বালুর উপরে বসিয়া পড়িয়া ভগবান ও সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যের কথা চিন্তা কবিতে লাগিলাম।

এমন সময়ে দূরে একটি অগ্নিশিখা দেখিতে পাইলাম। মনে আশার সঞ্চার হইল। আগুন যখন তখন মানুষও অবশ্য আছে। আমি অগ্নি লক্ষ্য করিয়া চলিলাম।

খানিকটা অগ্রসর হইয়া দেখিলাম সমুদ্রের ধাবে একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে আর অনেক লোক দাঁড়াইয়া আছে। শুনিয়াছিলাম কোন কোন দেশে মানুষ মরিলে আগুনে দাহ করে—ভাবিলাম সেইরূপ একটা কাণ্ড ঘটিতেছে।

আমি আরও কাছে আসিলাম। সকলেই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত ছিল, কাজেই কেহ আমাকে লক্ষ্য করিল না। দেখিলাম কাঠের ইন্ধন সাজাইয়া একটি অগ্নিকুণ্ড রচিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার উপরে কোন মৃতদেহ লক্ষ্য করিলাম না। এমন সময়ে দেখিলাম একজন জীবিত লোককে সকলে মিলিয়া বাঁধিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবার আয়োজন করিতেছে। আমি জানিতাম কোন কোন দেশে স্বামী মরিলে স্ত্রীকে সঙ্গে পোড়াইয়া মারা হয়; স্ত্রী মরিলে স্বামীকে অবশ্য পোড়াইয়া মারা হয় না—কারণ বেচারা তো বিবাহের পর হইতেই পুড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ভাবিলাম হয়তো এদেশে স্ত্রী মরিলে স্বামীকে সহমরণে যাইতে হয়—হয়তো বিবাহের সময় এমন কোন শর্ত থাকে। কিন্তু সে যাহা হোক, এখানে মৃত কোন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আমি দেখিতে পাইলাম না।

তখন কৌতূহল আর চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া অগ্রসর হইয়া একজনকে শুধাইলাম—মহাশয়, এ ব্যক্তিকে কেন পোড়াইয়া মারিতেছেন?

আমার প্রশ্নে সে বিস্মিত হইয়া বলিল—আপনি বুঝি বিদেশী?

আমি বলিলাম—আমি বিদেশী নাবিক, জাহাজ ডুবিতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছি।

তখন সে বলিল—তবে শুনুন, এ লোকটাকে পোড়াইয়া মারিবার কারণ ইহার চাকরি গিয়াছে! চাকরি গেলে মানুষের জীবনের আর কি সার্থকতা? তখন সে পুড়িয়া মরে—ইহাই এদেশের নিয়ম।...

সিন্ধবাদ অতিথিদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, বন্ধুগণ, এমন বিচিত্র দেশে বা এমন উচ্চাঙ্গের তত্ত্ব জীবনে আমি কখনো শুনি নাই। অনেক কারণে মানুষে আত্মনাশ করিয়া থাকে, কিন্তু অকৃত্রিম একটা আদর্শের জন্য মানুষে যে আগুনে পুড়িয়া মরিতে পারে—তাহা এই প্রথম শুনিলাম।

আমি তাহাদের দেশের কথা আরও শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহারা আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিল।

তখন তাহারা সকলে মিলিয়া সেই লোকটাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজাইতে লাগিল; খই, ধান্য, মুদ্রা বর্ষণ করিতে থাকিল আর সেই লোকটা জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মধ্যে বীরের মতো দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে ভস্মীভূত হইয়া কাঠকয়লায় পরিণত হইয়া গেল।

সিন্ধবাদ বলিতে লাগিল—বন্ধুগণ, আশ্চর্য সে দেশের লোকের ব্যবসা-বুদ্ধি! সেই কাঠকয়লা তখনি স্বর্ণকারেরা সেরদরে কিনিয়া লইয়া চলিয়া গেল। বিধাতার কি ন্যায়পরতা! যে লোকটা বাঁচিয়া থাকিতে যথেষ্ট স্বর্ণসঞ্চয় করিতে পারে নাই—তাহারই অঙ্গারীভূত দেহাবশেষ এখন রাশি রাশি স্বর্ণ গলিত করিবার কাজে লাগিবে। বিধাতার এমন বিচার আছে বলিয়াই এখনো পৃথিবীতে এত অন্যায়-অত্যাচার সত্ত্বেও লোকে জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হইয়া গেলে দলের একজন আমাকে বলিল—তুমি বিদেশী এখানে কোথায় থাকিবে? বরঞ্চ আমার সঙ্গে চলো। সেখানে আশ্রয় পাইবে, আর কৌতূহল যদি থাকে তো আমাদের দেশের রীতিনীতিও জানিতে পারিবে।

আমি হাতে যেন আকাশের চাঁদ পাইলাম। লোকটিকে ধন্যবাদ দিয়া তাহার সঙ্গে তাহার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

সেখানে লোকটি আমাকে বিশেষ আদর-যত্ন করিল, নূতন পরিধেয় দিল, আহার্যে পরিতৃপ্ত করিল। প্রচুর বিশ্রাম করিয়া শরীর ও মনের প্রফুল্লতা ফিরিয়া পাইলাম।

আমি লক্ষ্য করিলাম যে সকলেই সেই লোকটিকে বড়-দালানী বলিয়া ডাকিতেছে। আমিও তাহাকে বড়-দালানী বলিয়া সম্বোধন করিয়া ডাকিতে লাগিলাম।

২

পরদিন দ্বিপ্রহরে আহার ও বিশ্রামের পরে বড়-দালানীর কাছে গিয়া বলিলাম—মহাশয়, এবারে আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করুন, লোকটাকে আপনারা পোড়াইয়া মারিলেন কেন?

বড়-দালানী বলিল—আপনাকে গতকাল বলিয়াছি যে লোকটার চাকরি গিয়াছিল বলিয়াই সে পুড়িয়া মরিল। কেবল সে নয়, এদেশে যাহার চাকরি যায়—সে-ই পুড়িয়া মরে; ইহাই এদেশের শাস্ত্রের অনুশাসন।

আমি অবোধ তখনো চাকরির মহিমা ও তত্ত্ব জানিতাম না, তাই প্রশ্ন করিলাম—মহাশয়, চাকরি কি?

বড়-দালানী বলিল—আপনার প্রশ্ন অতিশয় জটিল, ব্যাপারটি অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। অনাদিকাল হইতে সনাতন মুনিঋষিগণ ইহার তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এ বিষয়ে হাজার গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, কাজেই আমার মতো সামান্য লোক তাহা বুঝাইতে অক্ষম। তবে সংক্ষেপে বলিতে পারি আমাদের ধর্মের নামান্তর চাকরি। আর এই দেশের নাম চাকরিস্তান।

এই বলিয়া সে বিরাট একখানা মানচিত্র খুলিয়া ফেলিয়া বলিল—এই যে বিরাট প্রাকৃতিক ত্রিভুজ দেখিতেছেন, ইহাই আমাদের দেশ। পশ্চিমদিকের ওই অংশটার নাম কাঁচিস্থান, মাঝখানে ওই হিন্দুস্থান আর পূর্বদিকের এই অংশটার নাম চাকরিস্থান বা চাকরিস্তান।

আমি শুধাইলাম—আর ওই যে অংশটা অনশন-ক্লিষ্টের চিবুকের মত সূচ্যগ্র হইয়া দক্ষিণ সমুদ্রের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে—উহার নাম কি?

বড়-দালানী বলিল—ওই অংশটার নাম কেরানীস্থান।

বড়-দালানী বলিয়া চলিল—আপনি যখন চাকবিস্তানে আসিয়া পড়িয়াছেন তখন আপনাকেও শীঘ্র একটি চাকবি সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে, নতুবা আপনারও সমুদ্রতীরের লোকটির দশা হইবে।

আমি বলিলাম চাকরি করিবাব মতো বিদ্যাবুদ্ধি তো আমার নাই।

সে বলিল—চাকরিতে বিদ্যাবুদ্ধিব প্রয়োজন নাই। ইহা অনেকটা ভগবৎসাধনাব মতো; বিদ্যাবুদ্ধিতে কিছু হয় না—নিষ্ঠাই আসল।

তখন আমি বলিলাম—এমন কি চাকবি আছে, যাহা বিদ্যাবদ্ধি ছাড়াও করা যায়?

বড়-দালানী বলিল—সব চাকরিই করা যায়, বিশেষভাবে এমন কয়েকটি আছে যাহাতে বিদ্যাবুদ্ধি থাকিলেই অসুবিধা হয়।

আমি জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া থাকিলাম।

সে বলিয়া চলিল—পাঠ্যপুস্তক বচনা, পত্রিকাব সম্পাদনা ও পাঠশালার শিক্ষকতার মধ্যে যে কোনটি আপনি গ্রহণ করিতে পারেন।

অতি অল্প বয়সে একসময়ে আমি মেষপালক ছিলাম, কাজেই পাঠশালার শিক্ষকতা সম্বন্ধে তখন হয়তো কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি; তাই বলিলাম, তবে আমাকে একটি শিক্ষকতা সংগ্রহ করিয়া দিন।

বড়-দালানী আমার অভিপ্রায় শুনিয়া খুশি হইলেন; বলিলেন—আপনার সঙ্কল্প সাধু—কারণ শিক্ষকতার মতো এমন পবিত্র ব্যবসায় আর নাই। স্বর্গের অমৃতের স্বাদ মর্তলোকে দিবাব ভাব আপনাব হাতে থাকিবে; আপনি জাতিগঠন করিয়া তুলিবেন, দেশের ভবিষ্যৎ আপনার হাতে; লোকে আপনাকে শ্রদ্ধা করিবে। ভদ্রলোকের বাড়িতে গেলে শিক্ষক শুনিয়া তাহারা বসিবার জন্য আপনাকে মোড়া

অগ্রসর করিয়া দিবে ; কিন্তু সাবধান আপনার দোকানদারের নিকটে কখনো যেন প্রকাশ করিবেন না আপনি শিক্ষক।

—কেন মহাশয় ?

—এমন অমূল্যরত্ন যাহারা দান করে লোকে প্রায়ই তাহাদিগকে মূল্য দিতে ভুলিয়া যায়। বেতন আপনি পাইবেন—খাতাপত্র হইতে গলিয়া কতটুকু এবং কবে আপনার হাতে আসিয়া পৌঁছিবে তাহা অনিশ্চিত।

আতঙ্কিত হইয়া শুধাইলাম—সে কি ?

—ভীত হইবেন না। জীবিত থাকিতে যদি না পান—তবু জানিবেন আপনার শ্রাদ্ধের সময় নিশ্চয় পাইবেন।

তবু খানিকটা আশ্বস্ত হইলাম।

বড়-দালানী বলিল—আপনাকে একটি উচ্চ-পাঠশালায় চাকরি সংগ্রহ করিয়া দিব—সেখানে মাসান্তে না হোক বৎসরান্তে বেতন নিশ্চিত পাইবেন।

৩

এখন আমি একটি উচ্চ-পাঠশালার অধ্যাপক। দেখিলাম ইহাতে যাহা কিছু উচ্চতা তাহা ওই নামেই। আমার বিদ্যাবুদ্ধির কথা কোন তরফ হইতেই উঠিল না। কোন তরফ এইজন্যে বলিলাম যে—পাঠ-শালার শিক্ষকদের দুইদল কর্তা ; একদল কর্তৃপক্ষ, অপর দল—ছাত্র-গণ। ইহাদের মধ্যে কোন্ দল বেশি প্রবল বলিতে পারি না, বোধ করি শেষোক্ত দলই কিছু বেশি—কারণ তাহাদের মাহিনা দিবার কথা। মাহিনা দেয় এমন মিথ্যা বলিতে পারি না [পাঠশালা সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিলে কেহ আমাদের ক্ষমা করে না ; অন্যত্র যাহা খুশি

হোক, তাহাতে আসে যায় না]; ছাত্রেরা কাগজপত্রে বেতন দেয়, কর্তৃপক্ষ আবার আমাদের কাগজপত্রে বেতন দেন। আমাদের কি করিয়া চলে? কেহ দর্জিগিরি করে, কেহ বাজার-সরকারী করে, কেহ পথ ঝাড়ু দেয়, আবার কেহ কেহ বা ক্ষেত-খামারের কাজ করে—গোরু তাড়ানো ভালোই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। এইভাবে দেশের ছেলেদের ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিতেছে; বর্তমানের কাদায় ডোবা, রথচক্র সবলে ঠেলিয়া লইয়া অদূরবর্তী স্বর্গের দিকেই নাকি আমরা চলিয়াছি। লোকে ধন্য ধন্য করিতেছে। সরকাব আমাদের কাজে গৌবব অনুভব করিতেছে। ছাত্ররা বলে—স্যার খুব ভালো মানুষ [পার্সেণ্টেজ কাটেন না]; কর্তৃপক্ষ বলে—লোকটি খুব বিনয়ী [বেতন চাহেন না]। আমবা দুই ক্লাসের ফাঁকে অধ্যাপকদের কক্ষে বসিয়া পরস্পরের ছিন্নবস্ত্র সেলাই করিয়া দিই এবং গত বৎসরের শূন্য নস্যকৌটার মধ্যে আঙুল চালাইয়া দিয়া সবলে নস্য গ্রহণ করি।

বড়-দালানীর সাবধানবাণী ভুলি নাই—দোকানীর কাছে কখনো বলি নাই যে আমি শিক্ষকতারূপ পবিত্র ব্যবসায়ে নিযুক্ত।

মাঝে মাঝে জানালা দিয়া তাকাইয়া দেখিতে থাকি দশটার সময়ে অজস্র জনতা চাকরি-মন্দিরের দিকে ছুটিয়াছে—কেহ ট্রামে, কেহ বাসে, কেহ রিক্‌শায়, কেহ কেহ বা মোটরকারে; ওই লোকটা হাঁটিয়া চলিয়াছে কেন? ও কি অধ্যাপক নাকি? তাহাদের মুখে চোখে তীর্থযাত্রীর ব্যগ্রতা! আবার দেখিলাম বেলা পাঁচটায় সকলে বাড়ি ফিরিতেছে—মুখে পরিতৃপ্তি, হাতে একজোড়া কপি, দেহে অবসাদ, পায়ে—না পায়ে তো জুতা নাই। তবে ও নিশ্চয় কোন এক উচ্চ-পাঠশালার অধ্যাপক।

এই রকম দেখিতে দেখিতে শূন্য উদরে পাকস্থলী যখন তীব্র মোচড়ে খাদ্যাগ্রহ করিয়া উঠিত চাকরকে বলিতাম—এক গেলাস জল

দে। শুনিয়াছিলাম শহরের জলে অনেক সময়ে টাইফয়েডের বীজাণু থাকে, সেই ভরসায় অনেকবার জল পান করিতাম। [কিন্তু পাছে আমরা অকালে দেশকে ফাঁকি দিই আশঙ্কায় কর্তৃপক্ষ টিউব-ওয়েলের বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।] আর বীজাণু থাকিলেই বা কি ? যে জঠরে এম. এ. পাসের বিদ্যে, প্রাত্যহিকী ক্ষুধা নিয়ত পরিপাক হইয়া যাইতেছে, সেখানে মূঢ় বীজাণু কি করিবে ?

কক্ষের অপর প্রান্ত হইতে দর্শনের অধ্যাপকের স্বর কানে আসিল —সক্রেটিস্...

এম. এ. পড়িবার সময়ে সক্রেটিস্ নামে একটা লোকের নাম শুনিয়াছিলাম। লোকটা 'হেমলক' পান করিয়া মরিয়াছিল কেন ? লোকটা কি অধ্যাপক ছিল নাকি ? আহা 'হেমলকের' ভরি কত ? নিজের অগোচর হাতখানা পকেটের মধ্যে গেল—ছিন্ন তলদেশ কোন বাধা দিল না। এ° কি অধ্যাপকেব পকেট কাটিল কে ? তবে অধ্যাপকের চেয়েও অসহায় কেহ আছে নাকি ? বোধ করি ইনস্যুর কোম্পানীর এজেণ্ট ! মরি, মরি বিধাতার কি আশ্চর্য বিধান ! 'সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র, এ দেশ !'

আজ মাসের পয়লা। দেখিতে পাইতাম পথে স্ফীতবক্ষ [যাহা ভাবিতেছ পাঠক, তাহা নয়] জনতা বুকপকেটে নোটের তাড়া গুঁজিয়া বাড়ি ফিরিতেছে। আমরাও কম কিসে ? শূন্য মধুভাণ্ডের চতুর্দিকে মধুমক্ষিকার মতো অফিসের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের চারদিকে বার কয়েক ঘুরিয়া হাতের খবরের কাগজখানা কয়েক ভাঁজ করিয়া বুকপকেটে রাখিয়া বুক ফুলাইয়া বাড়ি চলিলাম। পথে অন্য এক উচ্চ পাঠশালার অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা—বেচারার মুখ শুষ্ক। সে বলিল—ইস্ বুকপকেট যে ফেটে যাবে—এক তাড়া নোট—আপনাদের ভাগ্য ভালো। ঈর্ধ্যায় বেচারার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল।

আমি অনুকম্পামিশ্রিত হাস্যে বলিলাম—হেঁ হেঁ! আপনাদের বুঝি—

সে বলিল—সাবধানে যাবেন—কেউ তুলে নিতে পারে।

আমি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিলাম—Who steals my purse steals trash!

ধন্য ধন্য শেক্সপীয়ার। শুনিয়াছি তুমি Grammar School-এর মাস্টার ছিলে—সেখানেও কি এই ব্যবস্থা ছিল নাকি?

সঙ্গে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন; বলিলাম—চলুন এই পথে যাই, সোজা হবে।

তিনি বলিলেন—না, না, ওখানে নয়।

—কেন?

—ওখানে একটা মুচি বসে তার ভয়ে।

শুধাইলাম—সে আবার কি?

তখন তিনি নিজের জুতা জোড়াটা দেখাইয়া বলিলেন—দেখুন না, তালি দিতে দিতে এর মৌলিক চামড়ার আর কোন চিহ্ন নাই। একদিন সারাইয়া দিবার জন্য তাহাকে বলাতে সে বলিল—ও জুতা সারাইবার বিদ্যা তাহার নাই। তাহার গুরুজি ছাপরা জিলায় আছে—সে পারে। এখন মুচিটা আমাকে দেখিলেই হাসে। তারপরে বলিলেন—চলুন ওই পথে যাই।

আমি বলিলাম—ও পথে মুদিটা আছে। ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন ছিল না। তখন দুইজনে ব্ল্যাকআউটের অন্ধকারের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। অন্ধকার ঘনীভূত হইলে গবর্নমেণ্টের সামরিক ব্যবস্থাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে দুইজনে নির্ভয়ে প্রস্থান করিলাম।

৪

এমনিভাবে দিন চলিতেছিল—এমন সময়ে একদিন খবর আসিল হনলুলু দ্বীপে ভূমিকম্প হইয়াছে—তাহার তরঙ্গ নাকি চাকরিস্তানের রাজধানীতেও আসিয়া পৌঁছিবার আশঙ্কা আছে।

তখন সে কি ছুটাছুটি! ছেলে-বুড়া, জোয়ান-মুমূর্ষু, তরুণ-তরল, স্ত্রী-কন্যা, মেসো-পিসি, খুড়ো-খোঁড়া, পুত্র-পিতা, বোবা-রোগা, কালা-ধলা—যে যেদিকে পারিল ছুটিল। পাওনাদার পাওনা ছাড়িয়া ছুটিল, স্ত্রীলোক গয়না ফেলিয়া ছুটিল, গোয়ালা গাভী ফেলিয়া ছুটিল, ড্রাইভার পেট্রোল ছাড়িয়া ছুটিল, ডাক্তার রোগী ফেলিয়া ছুটিল, কবিরাজ হামান-দিস্তা ছাড়িয়া ছুটিল, স্বামী পরস্ত্রী লইয়া ছুটিল! কুলীরা যাত্রীর মাল লইয়া নিজের বাসার দিকে ছুটিল। তিনদিনের মধ্যে রাজধানী জনশূন্য।

কেবল আমরা অত্যুচ্চ হইতে নিম্নতম পাঠশালার শিক্ষকেরা শিবরাত্রির সলিতার মতো শহরে রহিয়া গেলাম। আশা ছিল ছাত্ররা ফিরিয়া আসিবে, আশা ছিল কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করিবেন, আশা ছিল গভর্নমেণ্ট 'কনসিডার' করিবেন, আশা ছিল হনলুলুর তরঙ্গ আসিয়া পৌঁছিয়া সকল সমস্যার শান্তি করিয়া দিবে। কিন্তু কেহই আসিল না। হায়, শিক্ষকদের সময় মতো মরিবার আশাও সফল হয় না।

আমরা যে বাড়ি গিয়া বসিয়া থাকিব তার উপায় নাই—পাঠশালার ক্ষুধিত পাষাণে আমাদের গ্রাস করিয়াছে। এখন আমরা চাদর ও আশা গৃহে ফেলিয়া রাখিয়া নিষ্কামভাবে পাঠশালায় আসি। শূন্য কক্ষে কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াই। শূন্য কক্ষের ছাদে কয়েকটি চামচিকা ও মেঝেতে কয়েকজন শিক্ষক—মাঝখানের শূন্য বেঞ্চিগুলিতে বসিয়া

বসিয়া যাহারা ক্লাসের সময়ে গল্প করিত—এখন তাহারা হয়তো নেত্রকোণার আমবাগানে হা-ডু-ডু খেলিতেছে।

এমনিভাবে দিন যায়, ক্রমে মাসের পয়লা তারিখও আসে! আমাব মুদির মুখমণ্ডল ক্রমশঃ মাড়োয়ারের মৃত্তিকাব বন্ধুবতাকেও ছাড়াইয়া যায়; রাষ্ট্রভাষা না শিখিয়া ভালোই করিয়াছি, সে যাহা বলে তাহার সবটা বুঝিতে পারি না—সবটা বুঝিবার দরকারও হয় না। গোয়ালা পঞ্চগব্যের মধ্যে নিকৃষ্টটার ব্যবস্থা করিবে বলিয়া শাসায়। ধোপানী মেয়েটা এইবার লইয়া নিরানব্বইবার আসিল। সে সাত ঘণ্টা বসিয়া থাকিয়া রাগে ঘামিয়া নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি গরগর করিয়া প্রস্থান করিল। আমি বসিয়া বসিয়া দেশের অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও আমার লোভনীয় অবস্থার কথা ভাবিতে থাকি।

এমন সময়ে একদিন কি করিয়া পাড়ায় প্রকাশ হইয়া পড়িল আমি উচ্চ পাঠশালার অধ্যাপক! সংবাদটি মন্ত্রের মতো কাজ কবিল। মুদি ব৷কিতে জিনিস দেওয়া বন্ধ করিল। গোয়ালা যাহা দিয়া গেল তাহা দুগ্ধ নয়। বন্ধুরা কথা বলা ছাড়িয়া দিল। বাড়িওয়ালা নোটিশ দিল। চাকর ঘরের তালা ভাঙিয়া সরিয়া পড়িল। রাস্তার ধারে একদল ছেলে একটা কুকুরকে ঢিল মারিবার উদ্যোগ করিতেছিল—কুকুরটা দন্তভঙ্গী করিতেই তাহারা ভয় পাইল। এমন সময়ে আমাকে দেখিয়া তাহারা বলিল—ওই একটা মাস্টার যায়—ওকে মার্। আমাব দন্তভঙ্গী করিবাব উপায় নাই—বাঁধানো দাঁত, ভাঙ্গিয়া গেলে আর গড়িতে পারিব না, তাই ঢিল হজম করতঃ অবিবেচক বালকদের ক্ষমা করিয়া সরিয়া পড়িলাম। পাড়ায় আমি একঘরে হইলাম।

কয়েকদিন পরে রাজধানীর শিক্ষকদের নিখিল-চাকরিস্তান-উচ্চ পাঠশালা সমিতির অধিবেশন হইল। সেখানে স্থির হইল—

শিক্ষকদের চাকরি যখন গিয়াছে তখন দেশের নিয়ম অনুসারে শীঘ্রই পুড়িয়া মরিতে হইবে। তাহার চেয়ে শিক্ষকেরা ঘোড়ার মাঠে যৌথভাবে যদি গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করে তবে দেশে একটা নৈতিক আলোড়ন উপস্থিত হইতে পারে এবং ভবিষ্যতের শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। দশ হাজার শিক্ষক ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় ঘোড়ার মাঠে গলায় দড়ি দিয়া মরা স্থির করিল।

ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানকে নষ্ট করিবার আকাঙ্ক্ষা আমার ছিল না, কাজেই শিক্ষকদের দলত্যাগ করিয়া সব্যসাচীর মতো দাড়ি-গোঁফ লাগাইয়া আত্মগোপন করিলাম।

৫

শিক্ষকদের আত্মত্যাগ দেখিবার জন্য নির্দিষ্ট দিনে ঘোড়ার মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে কি জনতা! এতদিন তাহারা সিনেমাতে মৃত্যু দেখিয়াছে, আজ সশরীরে মৃত্যু দেখিবার লোভে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত। মাঝে পরিষ্কার জায়গায় সারি সারি লোহার দণ্ড; লোহার দণ্ডে দড়ি ঝোলানো, এমন দশ হাজার। দশ হাজার শিক্ষক তাহাতে গলায় দড়ি দিয়া মরিবে। ব্যবস্থার ত্রুটি নাই; স্বয়ং পৌরসভা ও গভর্নমেণ্ট নাকি সহৃদয় হইয়া ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে শিক্ষকের দল আসিয়া হাজির হইল। ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল, হাততালি পড়িল। শিক্ষকদের মুখে স্বর্গীয় ভাব—অস্থিদানের পূর্বে দধীচির মুখে অনেকটা এই রকম জ্যোতি দেখা গিয়াছিল।

পরম মুহূর্ত উপস্থিত হইল। দশ হাজার শিক্ষক গলায় দড়ি পরিয়া 'বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে' বলিয়া ঝুলিয়া পড়িল, যেন দশ হাজার কলার কাঁদি বাতাসে দুলিতে লাগিল। ওঃ জনতার মধ্যে সে কি উৎসাহ,

সে কি আনন্দ, সে কি জয়ধ্বনি! ভিড়ের মধ্য হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—বাঃ স্যার বেশ গিয়েছেন, এক্সেলেণ্ট!

বাংলার অধ্যাপক নিতান্ত কৃশ ও লঘুকায়; ঝুলিয়া পড়িয়াও মরিতেছিল না; দয়াপরবশ হইয়া দু'জন লোক [বোধ করি ভূতপূর্ব ছাত্র] আসিয়া তাহার পা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল—বাংলার অধ্যাপক সাধনোচিত স্থানে প্রস্থান করিল।

ইংরেজীর সাড়ে তিনমণি অধ্যাপক ঝুলিতে উদ্যত এমন সময়ে উৎসাহী একজন ছাত্র ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—স্যার, একটা suggestion দিয়ে যান ; মিণ্টনের Lycidas কবিতার central idea কি?

কর্তব্যনিষ্ঠ সাড়ে তিনমণি ঝুলিয়া পড়িতে পড়িতে অর্ধোক্ত স্বরে বলিয়া ফেলিল—'এথ্'।

উৎসাহী ছাত্র বলিল—বুঝেছি স্যার—'ডেথ'।

দশ হাজার শিক্ষক মরিল। কে বলিল সভ্যতার অগ্রগতি হয় নাই? সেকালের একটা দধীচিকে লইয়া কত গৌরব—আর একালে দশ দশ হাজার দধীচি!

কিন্তু ইহার পরে যাহা ঘটিল তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। একদল লোক, ছুরি লইয়া ছুটিয়া গিয়া শিক্ষকদের গলা হইতে দড়ি কাটিয়া সংগ্রহ করিতে লাগিল। আমি পাশের একজনকে শুধাইলাম—ব্যাপার কি?

সে বলিল—উহারা নিখিল-চাকরিস্তান-মুমূর্ষু-রজ্জু-সংগ্রহ কোম্পানীর এজেণ্ট। এই দড়িগুলি সংগ্রহ করিয়া চড়া দামে বিক্রয় করিবে। ভাবিয়া দেখুন কত লাভ! প্রত্যেকের গলায় যদি দশ হাত দড়ি থাকে—তবে দশ হাজারে লক্ষ হাত। দড়ির বাজার যা চড়া! কোম্পানী বিনা মূলধনে বেশ দু' পয়সা কামাইবে।

কে বলিল চাকরিস্তানের লোকের ব্যবসা-বুদ্ধি নাই।

আমি সরিয়া পড়িলাম। শুনিলাম আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া দাহ করিবার জন্য হুলিয়া হইয়াছে। আমি প্রাণভয়ে সমুদ্র-তীরের দিকে রওনা হইলাম, যদি কোন বিদেশী জাহাজ দেখি তো এ দেশ হইতে সরিয়া পড়িব। সমুদ্রের তীরে গিয়া দেখি একখানি জাহাজ রহিয়াছে। নিকটে গিয়া দেখি আমারই দ্বিতীয় জাহাজখানি। তাহার নাবিকেরা বলিল—ঝড়ের মুখে পড়িয়া তাহারা যবদ্বীপে গিয়া উপস্থিত হয়। আমার আশা তাহারা ছাড়িয়াই দিয়াছিল—এখন আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। আমি জাহাজে উঠিয়া কয়েকমাস সমুদ্রযাত্রার পরে বসোরায় ফিরিয়া আসিলাম।

সিন্ধবাদ তাহার কাহিনী শেষ করিয়া সমাগত অতিথিদিগকে অনেক ধনরত্ন দান করিয়া সেদিনের মতো বিদায় দিল; যাইবার সময়ে বলিল—আগামীবার তাহার দশমবার সমুদ্রভ্রমণের কাহিনী বলিতে চেষ্টা করিবে।

"সদা সত্য কথা কহিবে"

পাঠক, যার কপালে দুঃখ আছে সে ভোগ করিবে, তার তুমিই বা কি করিবে আর আমিই বা কি করিব। কত ছেলেই তো বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় ভাগ পড়ে, কেহ তো এমন ভুল করে না—সকলেই তো সেই বিপদপূর্ণ উপদেশটাকে দিব্যি ডিঙাইয়া চলিয়া যায় এবং স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞানের বলে বোধোদয়ে পৌঁছিবার পূর্বে ভুলিয়া যায়। কিন্তু কপালে যার দুঃখ আছে সে ওখানে আটকাইয়া যায়।

কোন্ বিপদের কথা বলিলাম বোধ করি বুঝিতে পার নাই। না পারিবারই কথা, কারণ কাণ্ডজ্ঞানের বলে বহুদিন আগেই নিশ্চয় সে উপদেশটা ভুলিয়া গিয়াছ। তবে একবার মনে করাইয়া দিই—দ্বিতীয ভাগে আছে যে, 'সদা সত্য কথা কহিবে'। মনে পড়িয়াছে কি ?

আজ যার কথা বলিতে যাইতেছি এই কাণ্ডজ্ঞানের অভাবে সে ওই উপদেশটা ভুলিতে পারে নাই। ভুলিতে এক এক সময়ে তুমি আমিও পারি না ; যখন আর কেহ মিথ্যা কথা বলিয়া আমাদের স্বার্থহানি ঘটায় তখন এক একবার বিদ্যুতের মতো ধাঁ করিয়া কথাটা মনে পড়ে, তখন বিষম নৈতিক ঘূর্ণিবাত্যা সৃষ্টি করিয়া বসি। ঠিক সে রকম কথা বলিতেছি না। রামতনু ওই তার নাম, এই উপদেশে এমন বাধিয়া গিয়াছিল, যেমন বাধিয়া যায় দোদুল্যমান কোঁচার অগ্রভাগে তীক্ষ্নসূচি চোরকাঁটা—চোখে দেখা যায় না, কিন্তু পা ফেলিবার তালে তালে খোঁচাইতে থাকে।

একদা প্রভাতে, সুপ্রভাত বলিতে পারি না, রামতনু পড়িল—'সদা সত্য কথা কহিবে'। সন্ধ্যার মধ্যেই ভুলিয়া যাইত—কিন্তু তার মাস্টার

রামতনুর কাঁচা মনের উপরে এই গজালটাকে বারে বারে স্মৃতির হাতুড়ি ঠুকিয়া আচ্ছা করিয়া বসাইয়া দিল—ফলে হইল এই যে লক্ষ্মণের মতো শক্তিশেলবিদ্ধ হইয়া সে জীবনপথে চলিতে আরম্ভ করিল—ঠিক লক্ষ্মণেব মতো বলিতে পারি না—লক্ষ্মণ মরিয়া বাঁচিয়াছিল—রামতনু বাচিতে বাঁচিতে শেষে একদিন মবিল—অনেক দিন পরে।

রামতনু জিজ্ঞাসা করিল—মাস্টার মশাই, সদা সত্য কথা কহিবে—এটা কি সত্য?

মাস্টার মশাই বড় একটিপ নস্য লইয়া বলিল—এ ছাড়া কোন সত্য নাই।

রামতনু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা মাস্টার মশাই, সত্য কথা বলিলে লোকে কি করে?

মাস্টার মশাই মুখের মধ্যে খানিকটা দোক্তা ফেলিয়া দিয়া বলিল—লোকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান করে। মিথ্যাবাদীকে ঘৃণা করে।

রামতনু ভাবিল—কাল একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

পাঠক, আশা করি তুমি কখনও এ রকম পরীক্ষা করিবে না—যদিও সুযোগ দিনেব মধ্যে অসংখ্যবার পাইবে।

পরদিন ইস্কুলে রামতনুর সুযোগ আসিল। ক্লাসের পিছনের বেঞ্চে বসিয়া একটা ছেলে মাটিতে পা ঘষিতেছিল—পণ্ডিত বহু বার চেষ্টা করিয়াও ধরিতে পারিল না। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল—কেহ বলিতে পার কে জুতা ঘষিতেছে?

সকলে নীরব। রামতনু ভাবিল তবে কি এরা দ্বিতীয় ভাগ পড়ে নাই! সে বলিয়া উঠিল—পণ্ডিত মশাই—রমেশ।

রমেশ বড়লোকের ছেলে, তাতে বলিষ্ঠ; ক্লাসের সকলেই তাকে ভয় ও ভক্তি করে। রামতনুর কথা শুনিয়া সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল—না পণ্ডিত মশাই, রমেশ নয়, রামতনুই জুতা ঘসিয়াছে।

তখন পণ্ডিত মশাই উঠিয়া আসিয়া রামতনুকে মিথ্যাবাদী বলিয়া উত্তমরূপে প্রহার করিয়া ক্লাস হইতে বাহির করিয়া দিল। সে ক্লাসের বাহিরে আসিয়া চোখ মুছিবার অবকাশে বারংবার জপ করিতে লাগিল, 'সদা সত্য কথা কহিবে'। এমন সময়ে ক্লাস ছুটি হইল—ছেলেরা বাহিরে আসিয়া তাকে ধরিয়া কিল, চড়, ঘুষি, লাথি, যে যা পারিল মারিল। রামতনু যতই বলে, আমি সত্য কথা বলিয়াছি, ছেলেরা ততই তাকে বিদ্রূপ করিতে থাকে, কেবল বিদ্রূপ নয়, সঙ্গে কিল-চড়ও থাকে।

রামতনু বাড়ি ফিরিবার পথে ভাবিতে লাগিল—এ কি হইল! সত্য কথা বলিলে তাব ফল তো এমন ভয়ানক হওয়া উচিত নয়! দ্বিতীয় ভাগে তো এমন লেখে না। সেখানে তো সত্যবাদী গোপালকে সকলে খুব ভালোবাসিত। আচ্ছা, মাস্টার মশাইকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

পাঠক, রামতনুর যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকিত, অর্থাৎ সে তোমার আমার মতো 'স্মার্ট' বা 'ক্লেভার' হইত, তবে ইস্কুলেব অভিজ্ঞতাই তার পক্ষে যথেষ্ট হইত—মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রবৃত্তি আর হইত না, কিন্তু রামতনু তুমি আমি নয়—সে ক্ষণজন্মা পুরুষ—ভগবানের বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই তার জন্ম।

সে মাস্টারকে ইস্কুলের অভিজ্ঞতা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমাকে মারিল কেন?

মাস্টার বলিল—পণ্ডিত তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করিয়াই মারিয়াছে—সত্যবাদী জানিলে আদর করিত।

—কিন্তু ছেলেরা মারিল কেন? তারা তো জানিত আমি সত্য কথাই বলিয়াছি।

মাস্টার বলিল—মিথ্যাবাদীরা সত্যবাদীকে দেখিতে পারে না—তাই ঈর্ষাবশত মারিয়াছে।

পাঠক, রামতনুর মাস্টারের যুক্তির অভাব হয় না। সত্য কথা

বলিতে হইলে বলা উচিত ছিল—সুযোগ বুঝিয়া সত্য কথা বলিবে, বিপদ না থাকিলে এবং লাভের বা প্রশংসার আশা থাকিলে সদা সত্য কথা বলিবে।

রামতনু দ্বিগুণ উৎসাহে প্রতিজ্ঞা করিল সদা সত্য কথা কহিব। মূর্খ রামতনু!

পরদিন রামতনু বাপের সঙ্গে বাজারে গেল। তার পিতা মেছুনির নিকটে দশ আনার মাছ কিনিয়া একটি টাকা দিল। মেছুনি ছয় আনা ফেরত দিতে গিয়া ভুলক্রমে দুটি সিকি দিল। ভদ্রলোক সিকি দুটি ত্বরিতভাবে ট্যাঁকে গুঁজিয়া তাড়াতাড়ি ছেলেকে বলিল—চল।

মেছুনি ভুল বঝিতে পারিয়া বলিল—বাবু, পয়সা কি বেশি দিলাম?

সে বলিল—না না, ঠিক আছে।

সত্যবাদী রামতনু বলিয়া উঠিল—বাবা, দুটো যে সিকি দিল!

পিতা পুত্রের প্রতি চোখের ইঙ্গিত করিয়া বলিল—না গো তুমি একটি সিকি আর একটি দুআনি দিয়েছ।

মেছুনি আর একজনকে মাছ বেচিতে লাগিল, পিতা পুত্র চলিয়া গেল। আড়ালে গিয়া পিতা বলিল—পাকা ছোকরা কোথাকার—বাপের উপরে কথা!

রামতনু বলিল—বাবা, দ্বিতীয় ভাগে আছে, 'সদা সত্য কথা কহিবে'।

পিতা বলিল—আছে তো তোর কি হয়েছে? মাস্টারে এই সব বুঝি শেখায়? দেখছি একবার তোর মাস্টারকে!

বাড়ি গিয়া মাস্টারকে পিতা সব কথা বলিল। মাস্টার বলিল—দাঁড়ান, আমি দেখছি।

মাস্টার রামতনুকে শাসন আরম্ভ করিল—অর্থাৎ একখানি বাঁশের কঞ্চি কয়েক বার তার পিঠে পড়িল।

রামতনু বলিল—তবে কি সত্য কথা বলিব না?

মাস্টার বলিল—একশ'বার বলিবে, তাই বলিয়া পাত্রাপাত্র জ্ঞান নেই? বাপের উপরেও সত্য কথা!

রামতনু বুঝিল সত্য কথা বলিতে হইলে পাত্র বিচার করিতে হইবে।

মাস্টার ছাত্রের পিতাকে গিয়া বলিল—আজ্ঞে ও ছেলেমানুষ, সব কথার অর্থ বুঝিতে পারে না—এবার ঠিক হইয়াছে।

পিতা খুশি হইয়া বলিল—বেশ আজ হইতে তোমার দু'টাকা মাহিনা বাড়িল।

মাস্টার বুঝিল হিসাব শুধু জটিলতর হইল। মাহিনা পাওনা হয় বটে, কিন্তু কোনদিন পাওয়া যায় না। এতদিন দশ টাকার হিসাব রাখিত—এবার হইতে বারো টাকার হিসাব রাখিতে হইবে।

ক্রমে রামতনু ইস্কুল ছাড়িয়া কলেজে প্রবেশ করিল—কিন্তু বাল্য-কালের কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারিল না। 'সদা সত্য কথা কহিবে' রূপ প্রাচীন উপদেশটা সিন্ধবাদের বৃদ্ধের মতো স্কন্ধে চাপিয়া থাকিয়া তার নিশ্বাসরোধ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। যখনই সে সত্য কথা লইয়া কোনো বিপদে পড়িত তখনই সে তার পুরাতন মাস্টারের কাছে গিয়া উপদেশ চাহিত। মাস্টার উপদেশ দিয়া বলিয়া দিত—সত্য কথা বলিবার অভ্যাস ত্যাগ করিও না।

ফল হইল এই যে রামতনু ক্যারমের ঘুঁটির মতো সংসারের চারিদিকের দেয়ালে ক্রমাগত মাথা ঠুকিয়া মরিতে লাগিল। মাস্টার তাকে বলিয়া দিয়াছিল—সংসারে সত্য কথা বলিবার পুরস্কার যদি না-ই পাও দুঃখ করিও না, মৃত্যুর পরে স্বর্গে গিয়া (সত্যবাদী স্বর্গ

ছাড়া আর কোথায় যাইবে!) পুরস্কার পাইবে; এবং একদিন ঠিক ক্যারমের ঘুঁটির মতোই চারিদিকের দেয়ালে রিবাউণ্ড হইতে হইতে হঠাৎ এক সময় নরম জালের ঝুলিটার মধ্যে গিয়া পড়িবে—সেই [illegible] স্বর্গ।

রামতনু এই ভাবিয়া সান্ত্বনা পাইল, মরিতে অবশ্য একদিন হইবে—সেইদিন আমার পোয়াবারো—মিথ্যাবাদীরা সেদিন সত্যই মরিবে।

কিন্তু মৃত্যু তো মেসের চাকর নয় যে ডাক দিলেই আসিবে। ইতিমধ্যে তাকে সংসারে আর দশজনের মতো চলাফেরা করিতে হইল।

একদিন সে ট্রামে উঠিতে যাইতেছে এমন সময়ে দেখিতে পাইল একটা লোক এক ভদ্রলোকের পকেট হইতে টাকার থলিটা তুলিয়া লইতেছে। সে তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া পড়িয়া 'পকেটকাটা পকেটকাটা' বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। পকেটকাটা বিপদ দেখিয়া টাকার থলিটা চট্ করিয়া রামতনুর অলক্ষিতে তার পকেটে গুঁজিয়া দিয়া 'পকেটকাটা পকেটকাটা' বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল।

ক্রমে লোক জুটিয়া গেল—সেই ভদ্রলোকও আসিল। স্ট্রীটের পুলিস যখন দেখিল ছোরা-ছুরি নয়, টাকার ব্যাপার তখনই সে ছুটিয়া আসিয়া দুইজনকে ধরিল।

রামতনু বলিল—এই লোকটা পকেট কাটিয়াছে।

সে লোকটা বলিল—ওই কাটিয়াছে মাইরি! জমাদার সাহেব, পকেট সার্চ করিয়া দেখ।

পুলিস রামতনুর পকেট হইতে টাকার থলি টানিয়া বাহির করিয়া নিজের পকেটে রাখিল এবং তাকে টানিয়া থানায় লইয়া গেল।

বিচারে রামতনুর চারি মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হইল। বিচারের সময়ে সে দ্বিতীয় ভাগ দেখাইয়া বিচারককে বলিয়াছিল—সে সদা সত্য কথা বলে।

তার কথা শুনিয়া আদালতসুদ্ধ হাসিয়া উঠিল। বিচারক হাসে নাই বটে, কিন্তু রায় লিখিয়া তাকে জেলে পাঠাইয়া দিল।

পাঠক, রামতনু তোমার আমার মতো সাধারণ লোক হইলে চারি মাস পরেই বাহির হইতে পারিত কিংবা বোধ করি জেলেই যাইত না। কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া তার জন্মগ্রহণ। জেলের মধ্যে সত্য কথা বলিতে গিয়া কয়েদী, ওয়ার্ডার, জেলার, সুপার সকলের কাছে তাড়া খাইতে লাগিল এবং সত্য কথার অপ-প্রয়োগের জন্য চারি মাসের স্থানে আট মাস মেয়াদ খাটিয়া একদিন প্রভাতে (রামতনুর পক্ষে সুপ্রভাত নয়) বাহির হইয়া আসিল।

জেল হইতে বাহির হইয়া রামতনু বুঝিল সংসারে অধিকাংশ লোকই বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় ভাগ পড়ে নাই—নতুবা তারা এমন মিথ্যাবাদী কেন। সে স্থির করিল বাকি জীবনটা সে দ্বিতীয় ভাগের এই অদ্বিতীয় বাণী প্রচার করিয়া কাটাইয়া দিবে। সে দুইখানি পেস্টবোর্ডে বড় বড় "সদা সত্য কথা কহিবে" লিখিয়া গলায় ও পিঠে ঝুলাইয়া দিয়া কলিকাতার রাজপথে বাহির হইল এবং অনুমান করিল তার এই নৈতিক উদাহরণ (দুঃসাহস ?) অচিরে কলিকাতার চৌদ্দলক্ষ লোককে সত্যবাদী করিয়া তুলিবে। কিন্তু ঠিক যেমনটি ভাবিয়াছিল তেমনটি হইল না। পথে ছেলেরা ঢিল ছুঁড়িতে লাগিল—যুবকেরা ঠাট্টা করিতে লাগিল—বৃদ্ধেরা অনুকম্পা করিয়া বলিল—লোকটা পাগল। প্রথমে কয়েকদিন এই ভাবে চলিল—শেষে লোকের সমালোচনা কঠোরমূর্তি ধারণ করিল।

বুর্জোয়াগণ ভাবিল—লোকটা কম্যুনিস্ট।

কম্যুনিস্টগণ ভাবিল—লোকটা বুর্জোয়া, নহিলে এমন পুরাতন কথা বলিবে কেন ?

কংগ্রেসওয়ালারা ভাবিল—লোকটা লীগের টাকা খাইয়াছে।

লীগওয়ালারা ভাবিল—লোকটা কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার।

আন্তর্জাতিকবাদীরা ভাবিল—লোকটা সাভারকরের চর কি স্বয়ং সাভারকরও হইতে পারে।

হিন্দু মহাসভাওয়ালারা ভাবিল—আমাদের শাস্ত্রে কোথাও তো এমন কথা নাই—লোকটা মূর্খ!

জার্নালিস্টরা ভাবিল—লোকটা পরশ্রীকাতর—আমাদের ব্যবসা নষ্ট করিবে।

সাহিত্যিকরা ভাবিল—আমরা এতজন থাকিতে একটা লোকে দেশের মত বদলাইতে পারিবে না।

ব্যবসায়ীরা ভাবিল—লোকটা বেকার।

বেকারগণ ভাবিল—শ্লা এই উপায়ে দু'পয়সা করিতেছে।

ক্যাপিট্যালিস্টরা ভাবিল—লোকটা শ্রমিক।

শ্রমিকরা ভাবিল—বেটা ক্যাপিট্যালিস্টদের লোক।

প্রফেসারগণ ভাবিল—আমাদের এতদিনের শিক্ষা ছেলেরা ভুলিবে না।

মাস্টারগণ কিছু ভাবিল না—শুধু একবার হাসিল।

আর পুলিসে ভাবিল—বেটা বিশেষ করিয়া তাদেরই ঠাট্টা করিতেছে।

তখন সকলে মিলিয়া একদিন রামতনুকে কলেজ স্কোয়ারে পাকড়াও করিল এবং সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কি?

রামতনু কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া বলিল—আমি রামতনু।

তখন সকলের ভয় কাটিল—তারা পুনরায় সমস্বরে বলিল—লোকটা পাগল!

ফলে রামতনু পাগল সাব্যস্ত হইয়া রাঁচির পাগলাগারদে গভর্নমেণ্ট খরচে প্রেরিত হইল।

পাগলাগারদে গিয়া রামতনু ভ্রাতৃপাগলগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল—ভাই সব, সদা সত্য কথা কহিবে!

ভ্রাতৃপাগলগণ একস্বরে বলিল—ওটা পুরাতন কথা—নতুবা আমরা এখানে আসিলাম কি করিয়া!

রামতনু এবার মনের মতো সঙ্গী পাইল—এতগুলি সত্যবাদী যে পৃথিবীতে আছে তা সে কখনো কল্পনা করিতে পারে নাই। সে মনের আনন্দে সত্য কথা বলিতে লাগিল এবং তৎপরিবর্তে শালা, পাজি, চোর, জোচ্চোর প্রভৃতি সত্য কথা শুনিতে লাগিল!

অবশেষে একদিন, দীর্ঘকাল পরে, সত্য কথা বলিতে বলিতে এবং শুনিতে শুনিতে রামতনু মরিল।

স্বর্গে গিয়া স্বর্গের দপ্তরখানায় উপস্থিত হইয়া রামতনু চিত্রগুপ্তকে নিজের পরিচয় দিল—আমি সত্যবাদী রামতনু।

চিত্রগুপ্ত বলিল—ওঃ বুঝেছি।···এই বলিয়া তার দিকে একখানা টুল আগাইয়া দিল।

রামতনু বলিল—পৃথিবীতে অনেক ভুগিয়াছি, এবার এখানে কি পুরস্কারের বরাদ্দ আছে দেখি।

চিত্রগুপ্ত লেজার বুক্ এ রামতনুর হিসাবের পাতা খুলিয়া দেখিল এবং দেখাইল! রামতনুকে উচ্চৈঃশ্রবার লেজে বাঁধিয়া স্বর্গ ঘুরাইতে হইবে —নীচে স্বয়ং ধর্মরাজের স্বাক্ষর।

বিস্মিত রামতনু বলিল—এ কি রকম পুরস্কার?

চিত্রগুপ্ত বলিল—এটা পুরস্কার নয়, দণ্ড!

—দণ্ড? কিসের? সত্য কথা বলিবার?

চিত্রগুপ্ত বলিল—না, নির্বুদ্ধিতার।

—নির্বুদ্ধিতা? ভালো করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না!

চিত্রগুপ্ত বলিল—পারিবে না তা জানি। তুমি যে নির্বোধ! আমরা কি আর মিছা দণ্ড বিধান করি!

রামতনু বলিল—বুঝাইয়া দাও।

চিত্রগুপ্ত বুঝাইতে লাগিল—পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় অপরাধ নির্বুদ্ধিতা—স্মার্টনেস্ বা ক্লেভারনেসের অভাব। তুমি তার চরম দৃষ্টান্ত! এই বিধান তুমি যত রকমে ভঙ্গ করিয়াছ এমন কেহ করে নাই।

রামতনু বলিল—নির্বুদ্ধিতা কিসের? আমি সদা সত্য কথা বলিয়াছি।

চিত্রগুপ্ত হাসিয়া বলিল—ওটাই তো নিবুদ্ধিতার চরম!

রামতনু বিরক্তির সঙ্গে বলিল—তবে ওরকম একটা উপদেশ পুঁথিতে থাকে কেন?

চিত্রগুপ্ত বলিল—কে নির্বোধ—আর কে বুদ্ধিমান পরীক্ষার জন্য ও রকম দু'একটা উপদেশের বাধা আমরা সৃষ্টি করিয়া থাকি। মানুষ মাত্রেই তো ওটা পড়ে—কেউ তো তোমার মতো ওটাকে সত্য বলিয়া মনে করে না।

ততক্ষণে উচ্চৈঃশ্রবা দরজার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়া চিঁহি রব ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

রামতনু জিজ্ঞাসা করিল—আমার মাস্টার মহাশয়ের তবে এই দণ্ড হইবে?

চিত্রগুপ্ত বলিল—না, তার অক্ষয় স্বর্গ।

রামতনু বলিল—সে কি? তিনি কি তবে সত্যবাদী নহেন?

চিত্রগুপ্ত ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল—ঠোঁটের ফাঁক দিয়া তার সোনা-বাঁধা দাঁত দুটি দেখা গেল; সে বলিল—না, যে 'সদা সত্য কথা কহিবে' উপদেশ দেয়—তার মতো মিথ্যাবাদী আর কে আছে? সে খুব ক্লেভার। তোমার মাস্টার—আমাদের চর। শুধু তোমার

মাস্টার নয়—মাস্টার ও প্রফেসারগণ আমাদের গুপ্তচর, যাকে বলে এজেন্ট প্রভোকেটর।

এখন সত্যবাদী নির্বোধ রামতনু উচ্চৈঃশ্রবার লেজে বদ্ধ হইয়া হেটমুণ্ড হইয়া স্বর্গ পরিভ্রমণ করিতেছে। মাঝে মাঝে পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া মিথ্যাবাদী ক্লেভার পৃথিবীর লোককে ধিক্কার দিতেছে—বোধ হয় এখনও তার ভুল ভাঙে নাই! সে স্থির করিয়াছে মেয়াদ ফুরাইলে একবার স্বয়ং ব্রহ্মার কাছে আপীল করিবে। কিন্তু মূর্খ জানে না যে, অনেক সময়ে আপীলে দণ্ড বাড়িয়া যায়। কিন্তু সে ভয় নাই—কারণ রামতনুর দণ্ড আজীবন! ভাষা ঠিক হইল না, জীবন তো তার শেষ হইয়াছে—যতদিন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড থাকিবে আর তার আত্মা থাকিবে ততদিন সে অশ্বচক্রে পরিভ্রমণ করিতে থাকিবে!

ব্রহ্মা নিশ্চিন্ত! তুমিও নিশ্চিন্ত হইতে পার—সে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া আর তোমার ক্লেভারনেসে বাধা দিতে আসিবে না!

ইহা ফাঁকা গল্প নয়—নীতিমূলক গল্প। সে নীতিটি এই যে, তাক্ বুঝিয়া সত্য কথা বলিতে পারিলে পৃথিবীতে সম্মান ও ঐশ্বর্য পাইবে আর মৃত্যুর পরে অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়া ইচ্ছামতো পারিজাতের বনে উর্বশী-রম্ভাদের লইয়া পিক্‌নিক করিতে পারিবে—তবে মাঝে মাঝে উচ্চৈঃশ্রবার লেজে বদ্ধ রামতনু ঘুরিতে ঘুরিতে কাছে আসিয়া পড়িলে, যদি লজ্জাবোধ হয়, উর্বশীর আঁচলে মুখ লুকাইও।

অধ্যাপক রমাপতি বাঘ

সুন্দরবনে বিকটজঙ্ঘা নামে এক বাঘ বাস করিত। তাহার দৌরাত্ম্যে বনের পশুরা অস্থির হইয়া ছিল। আর যে সব কাঠুরিয়া বনে কাঠ সংগ্রহ করিতে যাইত তাহাদেরও অনেকে বিকটজঙ্ঘার গ্রাসে প্রাণ হারাইত। অনেক শিকারী তাহাকে বধ করিতে গিয়া তাহার শিকারে পরিণত হইয়াছে, কিছুতেই কেহ তাহাকে আটিয়া উঠিতে পারিত না—এমনই ছিল বিকটজঙ্ঘার বুদ্ধি ও গায়ের জোর। একদিন সে শিকার সন্ধানে বাহির হইয়া বনের প্রান্তে এক সন্ন্যাসীর কুটিরে উপস্থিত হইল। সে দেখিতে পাইল যে, সন্ন্যাসী চোখ বুজিয়া ধ্যান করিতেছে—আর নিকটেই একটি ছাগল বাঁধা রহিয়াছে। ডবল শিকার দেখিতে পাইয়া তাহার মনে বড় উল্লাস হইল। সে ভাবিল—আজ কোনটাকে আহার করিবে? দুইটাকেই, না একটাকে? সে স্থির করিল যে, আজ ছাগলের মাংস খাওয়া যাক—আগামী কল্য সন্ন্যাসীর সদ্‌গতি করিলেই চলিবে। সে দেখিল ছাগলের মাংস কোমল আর সন্ন্যাসী শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। কোমল পাইলে কে কাঠ খায়? তখন সে হুঙ্কারে ছাগলের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল।

ইতিমধ্যে সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ হইল। সে বিকটজঙ্ঘার কাণ্ড দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং তাহার উদ্দেশ্যে শাপ দিল, বলিল—আরে পাষণ্ড, তুই যে কুকর্ম করিলি তাহার পূর্ণ ফল তোকে ভোগ করিতে হইবে। তোকে মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া বেসরকারী কলেজের অধ্যাপকরূপে কাজ করিতে হইবে।

সন্ন্যাসীর শাপ শুনিয়াই বাঘ ভয়ে অস্থির হইয়া তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িল; বলিল—প্রভু, অধমকে সন্তানজ্ঞানে ক্ষমা করো।

সন্ন্যাসী বলিল—আমার শাপ ব্যর্থ হইবার নয়।

তখন ব্যাঘ্র শুধাইল—প্রভু, অধ্যাপকজন্ম হইতে কিরূপে নিস্তার পাইব ?

সন্ন্যাসী বলিল—ঘুরিতে ঘুরিতে তুমি একদিন আমার আশ্রমে উপস্থিত হইবে, সেদিন আমিই আবার তোমাকে ব্যাঘ্ররূপ দান করিব —এখন যাও।

বাঘ কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল।

২

রমাপতি বাঘ 'বৃহৎ গৌড়ীয় কলেজে'র অধ্যাপক। কলেজটি বেসরকারী। সকলেই জানেন যে, বেসরকারী কলেজের মতো এমন বে-ওয়ারিশ বস্তু আর নাই। খাস পতিত যেমন সকলেরই, বেসবকাবী কলেজগুলিও তেমনি সরস্বতীর খাস পতিত। একটি ছোট বাড়ির মধ্যে পাঁচ হাজার ছাত্র, একশত অধ্যাপক এবং দেড়শত কেরানী, বেয়ারা, চাপরাশি পুরিয়া দিয়া আগুন ধরাইয়া দিলে যেমন কোলাহল উঠিতে পারে, বিদ্যাভ্যাসকালে বৃহৎ গৌড়ীয় কলেজ হইতে তেমনি একটা ত্রাহি ত্রাহি শব্দ উঠে, পাড়ার লোকে বুঝিতে পারে যে কলেজের এঞ্জিন পুরা দমে সক্রিয়।

রমাপতি বাঘ কলেজে চাকরির জন্য দরখাস্ত করিলে 'ইণ্টার-ভিউ'র আহ্বান পাইল। ইণ্টারভিউ কমিটি রমাপতির গুণপণা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করিল—আপনি কতটা লাফ দিতে পারেন ?

রমাপতি উত্তর করিল—কখনো পরীক্ষা করি নাই, তবে পালাইবার প্রয়োজন হইলে খুব সম্ভব এক লাফেই পগার পার হইতে পারি।

কমিটি তাহার সরল উত্তরে খুশি হইল।

প্রিন্সিপ্যাল রমাপতির গায়ের চামড়া পরীক্ষা করিয়া সকলকে বলিল—বেশ শক্ত বলেই মনে হচ্ছে।

সকলেই খুশি হইল বলিয়া তাহার মনে হইল। তখন প্রিন্সিপ্যাল বলিল—আপনাকে নিযুক্ত করা হলো—বেতন একশ' টাকা। আর আপনি নামের গোড়ায় 'প্রোফেসার' শব্দটি ব্যবহার করতে পারবেন, তার মূল্য কম নয়, ধরুন পঞ্চাশ টাকা—তা হলেই দাঁড়ালো দেড়শ' টাকা।

রমাপতি নগদে ও শব্দে দেড়শ' টাকার নিয়োগপত্র পাইয়া খুশি-মনে বাসায় ফিরিল। কমিটি তাহার বিদ্যাবত্তার পরীক্ষা করিল না। অন্যান্য গুণের বলেই কলেজে অধ্যাপক নিয়োগ হইয়া থাকে—তবে সত্যের খাতিরে স্বীকার করিতে হয় যে, কাহারো বিদ্যা থাকিলে তাহা বাধাস্বরূপ গণ্য হয় না।

রমাপতি বাঘ• কলেজে আসিয়া প্রথম দিনেই বুঝিতে পারিল কেন তাহার লম্ফশক্তি ও চর্মপরীক্ষা করা হইয়াছিল। কলেজে যদুবাবু নামে একজন সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ছিল। সে একদিন ক্লাসে একটি ছাত্রকে প্রশ্ন করিয়া বসিয়াছিল। ছাত্রদের অধিকার অনুসারে ইহা ঘোরতর অন্যায়। ছাত্রদের দাবি এই যে, অধ্যাপক নিজেই প্রশ্ন করিবে, নিজেই উত্তর দিবে, তাহারা বসিয়া বসিয়া অধ্যাপকের বিদ্যার গভীরতা পরীক্ষা করিবে। যদুবাবুর প্রশ্নে উত্তেজিত হইয়া ক্লাসসুদ্ধ ছাত্র তাহাকে তাড়া করিল। যদুবাবু অনন্যোপায় হইয়া দোতলা হইতে নিচে লাফাইয়া পড়িল। ছেলেরা শিক্ষকের গুণে মুগ্ধ হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল—না, স্যারের Qualification আছে—ওঁকে আর কিছু বলা হবে না। তারপর হইতে যদুবাবু ছাত্রদের সুদৃষ্টির ছাড়পত্র পাইল। তখন হইতে যদুবাবু ক্লাসে প্রশ্ন করিলেও কেহ আপত্তি করিত না, যদিচ কেহ উত্তর দিবারও প্রয়াস করিত না।

রমাপতি বুঝিল 'ইণ্টারভিউ' কমিটি দয়ালু বলিয়াই তাহার প্রলম্ফন শক্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া লইয়াছিল।

রমাপতি বাঘের শরীরটি ক্ষীণ বটে কিন্তু মুখটি গোলগাল মস্ত। তাহার মুখে এক জোড়া গোঁফ ও বসন্তের দাগ আছে। তার উপরে আবার গলার স্বরটি গম্ভীর। সে গিয়া বসিলে হঠাৎ তাহাকে একটি ধুতিচাদর-পরিহিত শিকারসন্ধানী বাঘ বলিয়া মনে হওয়া বিচিত্র ছিল না। তার উপরে আবার তাহার উপাধি 'বাঘ'। ছাত্ররা আড়ালে তাহাকে শার্দূল ও Mr. Tiger বলিয়া ডাকিত। কখনো কখনো ছাত্ররা ব্ল্যাক বোর্ডে লিখিয়া রাখিত, 'দি রয়াল বেঙ্গল টাইগার'। রমাপতি সব শুনিয়াও শুনিত না, দেখিয়াও দেখিত না। সে বুঝিয়া লইয়াছিল যে বেসরকারী কলেজের অধ্যাপকদের চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি অতিরিক্ত সজাগ হওয়া কিছু নয়, কেবল প্রয়োজনকালের জন্য পা দুখানিকে মজবুত রাখিলেই চলিবে। যদুবাবুর পরীক্ষা দেখিবার সৌভাগ্য তাহার হইয়াছে। সেই অনিশ্চিত দুর্দিনের আশঙ্কায় সে পা দুটিতে ভালো করিয়া তেল মাখাইত, মাথার জন্য এক ফোঁটাও অবশিষ্ট থাকিত না। সে ইতিমধ্যে বুঝিতে পারিয়াছে অধ্যাপকদের মাথা অবান্তর, নিতান্ত না থাকিলে লোকে কন্ধকাটা বলিবে এই লজ্জাতেই ওই অনাবশ্যক ভারটাকে বহন করিয়া চলিতে হয়, তাহাদের আসল অঙ্গ পা দুটি। এতদিন পরে সে বুঝিতে পারিল অধ্যাপকগণের পদগৌরবেব কথা কেন সকলে ঘন ঘন বলিয়া থাকে।

৩

পনেরো বৎসর অধ্যাপনা করিবার পরে রমাপতিবাবুর বেতন আজ লোভনীয় দেড়শতে উঠিয়াছে। সে এখন একজন সিনিয়র অধ্যাপক।

কলেজ কমিটির চেয়ারম্যান তাহাকে বলে—হেঁ হেঁ, আপনি তো এখন একজন 'সিনিয়র মেম্বার অব দি স্টাফ'।—এই উক্তির সরল অর্থ এই যে এখন বেতন বৃদ্ধির দাবি না করিবার মতো বয়স তোমার হইয়াছে।

এই পনেরো বৎসরে রমাপতিবাবুর পাঁচটি দাঁত পড়িয়াছে। অধ্যাপকদের দাঁত অল্প বয়সে পড়ে, কারণ গঙ্গার তোড়ে ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিল আর জ্ঞানগঙ্গার উচ্চারণের দুরন্ত স্রোতে সামান্য দাঁত কতদিন টিকিতে পারে! রমাপতিবাবুর চুল পড়িয়া পড়িয়া পাতলা হইয়া গিয়াছে। এখন তাহার শরীর কৃশতর, চক্ষু দুটি মস্তিষ্ক-কোটরস্থায়ী জ্ঞানের অন্বেষণে কোটরগত। এই তাহার ক্ষতির দিক। লাভের দিকও অল্প নয়। মাথায় একটি টাক অর্জিত হইয়াছে, আর ডায়াবিটিস ও ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস স্থায়ী বাসা বাঁধিয়াছে তাহার শরীরে। ডায়াবিটিস ধরা পড়িবার পরে রমাপতিবাবুর দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল। ডায়াবিটিসে নাকি অধ্যাপকের গরিমা বাড়ে—ও একটা মস্ত কোয়ালিফিকেশন। পাছে ডায়াবিটিস সারিয়া গেলে ঐ দশ টাকা কমিয়া যায় তাই রমাপতিবাবু সেটাকে সযত্নে লালন করে—অর্থাৎ প্রাণও থাকে, ডায়াবিটিসও থাকে, এমনভাবে চিকিৎসা করায়।

সংসারে রমাপতিবাবুর গৃহিণী বাদে চার-পাঁচটা সন্তান। কলেজের বেতনে কলিকাতায় সংসার চলে না। তাই তাহাকে উপরি রোজগারের চেষ্টা করিতে হয়। সকালে একটি টিউশানি অর্থাৎ ছাত্রের বাড়ির বাজার—এবং সন্ধ্যায় দুইটি টিউশানি অর্থাৎ ছাত্রের পিতার মোসাহেবি তাহাকে করিতে হয়। ধনীরা অধ্যাপক মোসাহেব পছন্দ করে; কারণ সে সর্বদা জল কাৎ বলিতে প্রস্তুত। রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিনে (সঞ্চিত বিদ্যা পরিপাক করিবার জন্য কলেজে ছুটি অনেক)

রমাপতি বাঘ বাদা অঞ্চলে গিয়া ঘাস কাটিয়া আনিয়া কলিকাতার বাজারে বিক্রয় করে। বন্ধুরা শুধাইলে বলে—এটাও আমার অধ্যাপনাব্রতের সুদূরপ্রসারী কাজ। সে বুঝাইয়া দেয়—এই তাজা ঘাস খেয়ে কলকাতার গোরুর স্বাস্থ্য ভালো হবে, স্বাস্থ্যবান গোরুর দুধ খেয়ে শিশুরা সুস্থ সবল হবে—আর তারাই তো আমার ভবিষ্যতের ছাত্র। বন্ধুরা তাহার যুক্তি স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। এই কাজ ছাড়াও তাহাকে কাটা কাপড়ের দোকানে ফরমাইস খাটিতে হয়, দাদের মলম ফিরি করিতে হয়, বড় বড় উপাধিধারীর নামে যুগান্তকারী পুস্তক লিখিয়া দিতে হয়। এসব কথা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ জানে। কিন্তু তাহাদের বিশ্বাস—কিছুতেই অধ্যাপকের মর্যাদার হানি হয় না—অধ্যাপকের মর্যাদার এমনি পাকা গাঁথুনি।

এতৎ-সত্ত্বেও কলেজে কেহ রমাপতিবাবুর উপর খুশি নয়। ছাত্ররা তাহাকে শত্রু মনে করে, কারণ সে ছাত্রদের সত্যিই কিছু শিখাইতে চায়। ছাত্র যদি একবার বুঝিয়া ফেলে যে শিক্ষক তাহাকে শিখাইতে চায়, তবে সে শিক্ষকের সর্বনাশ। সহকর্মীরা তাহাকে প্রীতির চক্ষে দেখে না, কারণ সে কর্তব্যনিষ্ঠ! অন্যান্য অধ্যাপক যখন টেবিল ঘিরিয়া নবরত্নের সভা করিয়া রেশন-প্রথার সমালোচনা করিতে থাকে, দর্শনের বৃদ্ধ অধ্যাপক যখন জন্মান্তরের সংস্কারের অনুসন্ধানের ন্যায় দাঁতের ফাঁকে জিহ্বা চালাইয়া মধ্যাহ্ন-ভোজনাস্তিক ইলিশ মাছের কাঁটা দিয়া রাঁধা কচু শাকের স্বাদ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে, সংস্কৃতের অধ্যাপক যখন নিরিবিলি বসিয়া সূচসূতা সহকারে ছিন্নবস্ত্রখানা সেলাই করিয়া যায়, ঘড়ির কাঁটা নির্দিষ্ট পর্বের মধ্যে অনেকখানি হেলিয়া পড়িলেও যখন সকলে না দেখিবার ভান করে, তখন, অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে অধ্যাপক বাঘ চাদর ও রেজিস্ট্রী বহি লইয়া উঠিয়া পড়ে, এক গ্লাস জল পান করিয়া লয়—তার পরে দ্রুত ক্লাসের দিকে প্রস্থান

করে। আগে আর সকলকে সজাগ করিয়া দিত—এখন আর সে চেষ্টা করে না। এমন কর্তব্যনিষ্ঠ সহকর্মীর উপরে রাগ না করাই অস্বাভাবিক। কলেজের কর্তৃপক্ষও তাহার উপরে খুশি নয়। অধ্যাপকরা ফাঁকি দিলেও কর্তৃপক্ষ জোর করিতে পারে না—কারণ তাহারা জানে যে পেট ভরিয়া খাইতে না দিলে কাজের তাড়া দিবার অধিকার থাকে না। বরঞ্চ তাহারা চায় যে, অধ্যাপকরা একটু আধটু ফাঁকি দিক, কারণ ঐ দুর্বলতাটুকু না থাকিলে অধ্যাপকরা ঘন ঘন বেতন বৃদ্ধির দাবি করিয়া বসিবে। ফাঁকির ফাঁক দিয়া অধ্যাপকদের নৈতিক অধিকার গলিয়া যাক, ইহাই কর্তৃপক্ষের বাসনা। রমাপতি বাঘ কর্তব্যনিষ্ঠ—অর্থাৎ যে কোন সময়ে আসিয়া সে বেতন বৃদ্ধির দাবি জানাইতে পারে। এমন লোকের উপরে কোন্ কর্তৃপক্ষ খুশি হয়?

ঘটিলও তাই। কলেজের 'মরাল কোডের' সবচেয়ে বড় অপরাধ রমাপতি বাঘ করিয়া বসিল। সে দশ টাকা বেতন বৃদ্ধির দাবি করিল। তাহার এই দুঃসাহসিক কার্যে কলেজের জমাদার হইতে কলেজ কমিটির চেয়ারম্যান অবধি সকলের নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম দেখা দিল। প্রথম কয়েক ঘণ্টা কেহ কথা বলিতে পারিল না। নীরব সমালোচনার পালা শেষ হইলে সরব আলোচনা শুরু হইল।

ঝাড়ুদার বিড়ি ধরাইতে ধরাইতে বলিল—বাবুর ভবিষ্যৎ খারাপ হয়েছে।

জমাদার বলিল—ভবিষ্যৎ নয়, মাথা।

হেড ক্লার্ক বলিল—এ রকম 'কেস' আমি ত্রিশ বছরের চাকরি জীবনে শুনি নি।

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট বলিল—ওর কুষ্ঠিখানা একবার দেখা দরকার।

ভাইস প্রিন্সিপ্যাল বলিল—হাম্বাগ।

প্রিন্সিপ্যাল ভাবের অনুরূপ ভাষা না পাইয়া শুধু বলিল—রমাপতি বাঘ।

সহকর্মীরা বলিল—আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গেল।

চেয়ারম্যান বলিল—একটা ব্যবস্থা করতে হয়—এরকম দৃষ্টান্ত স্টাফের সম্মুখে থাকা উচিত নয়।

ছাত্ররা বলিল—এটা কাপিট্যালিস্টদের ষড়যন্ত্রের ফল।

তাহারা বলিতে পারে বটে—কারণ সারা বছর কলেজ-বেতনের টাকায় সিনেমা দেখিয়া পরীক্ষার পূর্বে দেড়শ' টাকা দেনার স্থলে হাতে পায়ে ধরিয়া পঞ্চাশ টাকায় যাহারা দেনা শোধ করে, পাঁচ টাকা মাহিনা বৃদ্ধিব দাবিকে তাহাদের ধনিক সমাজের ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কি মনে হইবে ?

পনেরো বছর পরে সকলে একযোগে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল—রমাপতিবাবু পড়াইতে পারে না, তাহার দাঁত নাই, তাহার চাদর ছেঁড়া, সে সেকেণ্ড ক্লাস এম.এ., তাহাও আবার খয়রাতি নম্বরের জোরে। কোন কোন অনুসন্ধিৎসু সহকর্মী বলিল—আমরা আরও অনেক কিছু জানি—ওঁর স্ত্রী বাপের বাড়ি যায় না কেন—

অপর একজন বলিল—থাক, থাক—, অর্থাৎ খুলিয়া বলিলে যেমন অনুমান করিয়াছি সে আশা ভঙ্গ হইতে পারে।

রমাপতি বাঘের চাকরিটি গেল। শুধু তাহাই নয়। সে কলেজ হইতে বাহির হইবামাত্র দেড়শত ছাত্র তাহাকে তাড়া করিল। রমাপতিবাবুর পদমর্যাদা এইবারে কাজ দিল। সে ছুটিল—ছাত্ররা ছুটিল—কিন্তু অধ্যাপক বাঘের নাগাল পাইল না। অধ্যাপক বাঘের স্বপদসেবা ব্যর্থ হয় নাই—তাহার দুর্মূল্য তৈলখরচ সার্থক হইয়াছে।

রমাপতি বাঘ ছুটিতে ছুটিতে ছাত্রদের অনেক পিছনে ফেলিয়া

সুন্দরবনে গিয়া পৌঁছিল। অধ্যাপক বাঘ দেখিতে পাইল বনের প্রান্তে এক কুটিরের আঙ্গিনায় এক সন্ন্যাসী ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছে। বাঘ একেবারে তাহার পায়ে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল, বলিল—বাবা, রক্ষা করো।

সন্ন্যাসী চোখ খুলিবামাত্র বাঘকে চিনিতে পারিল, বলিল—বৎস, তোমাকে আমি চিনি, এবার তোমার দুঃখ ঘুচিবে।

বাঘ বলিল—তার মানে আমার অধ্যাপকজন্ম ঘুচিবে? কিন্তু, তাহা কি সম্ভব?

কেন নয়?—বলিয়া সন্ন্যাসী তাহার গায়ে একটু জল ছিটাইয়া দিল—অমনি অধ্যাপক রমাপতি বাঘ প্রকাণ্ড এক সুন্দরবনী বাঘে পরিণত হইয়া গর্জন করিয়া উঠিল—হালুম। অর্থাৎ মালুম হইল যে আমার দুঃখের কারণ তুমিই।

অমনি সে সন্ন্যাসীর ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল। সন্ন্যাসী তাহাকে পত্রিকার পূজা সংখ্যার সম্পাদক হইবার অভিশাপ দিতে উদ্যত হইয়াছিল—কিন্তু সময় পাইল না। ভূতপূর্ব অধ্যাপক বাঘ সন্ন্যাসীর ঘাড় ভাঙ্গিয়া পরমানন্দে বসিয়া রক্তপান করিতে লাগিল। এতদিনে সত্য সত্যই তাহার দুঃখের অবসান ঘটিল।

প্রফেসার রামমূর্তি

অবশেষে চাকরিটি গেল।

তারপর কি হইল? ইহাই কি যথেষ্ট নয়? বাঙ্গালীর জীবনে ইহার চেয়ে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি আর কি হইতে পারে?

কিন্তু আপনাদিগকে একেবারে হতাশ করিব না—তারপরেও কিছু ঘটিল। কিন্তু তার আগের কথা প্রথমে বলিয়া লই।

রামনাথবাবু প্রাইভেট কলেজের অধ্যাপক। 'প্রাইভেট কলেজ' কথাটা নিতান্ত স্বতোবিরুদ্ধ—ওরকম পাবলিক জিনিস আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ। কলেজের ঝাড়ুদার হইতে উচ্চতম ব্যক্তি পর্যন্ত সকলেই ইহার কর্তৃপক্ষ; এমন কি মাঝে মাঝে পথের পথিক ও ফিরিওয়ালা পর্যন্ত ঢুকিয়া শাসাইয়া যায়।

এহেন প্রাইভেট কলেজে রামনাথবাবু অধ্যাপক। আমার অনেক অধ্যাপক বন্ধু আছেন, তাঁহাদের খাতিরে রামনাথবাবুর বেতন কত সে কথাটা চাপিয়া গেলাম; বেতন যাই হোক, নামের আগে ইঁহারা অধ্যাপক ও প্রফেসার শব্দদ্বয় যোগ করিতে পারেন; ওই শব্দ দুটার এমনি মোহ যে, কৌশলে ব্যবহার করিতে পারিলে অর্থের মোহের প্রতিষেধকের কাজ করে, কলেজের কর্তৃপক্ষ ইহা সবিশেষ অবগত আছেন। লোকনিয়োগ করিবার সময়ে তাঁহারা হাসিয়া বলেন—এখন থেকে তো আপনি অধ্যাপক—মানে 'স্যালারি' যাই হোক্ না—

উভয়পক্ষ হাসিয়া ওঠেন—হেঁ হেঁ হেঁ···

এহেন অধ্যাপক রামনাথবাবু—চাদর কাঁধে ফেলিয়া প্রত্যহ কলেজে যান। অধ্যাপকের দল সর্বদা একখানা চাদর কেন সঙ্গে

রাখে, এ বিষয়ে আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি; অবশেষে তাঁহাদের জীবনযাত্রা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে কোন মুহূর্তে ইহাদিগকে নিকটতম ল্যাম্প পোস্টের সঙ্গে ঝুলিয়া পড়িতে হইতে পারে—তখন পাছে সরঞ্জামের অভাবে পড়িতে হয়—তাই এই ব্যবস্থা!

অধ্যাপকদের মধ্যে বলাবলি হয়—আমাদের মাইনে কম, কিন্তু ছুটি অনেক—

একজন বলে—তার মানে কি জানেন? কর্তৃপক্ষ জানে টাকা বেশি দিতে পারবে না, তাই সময় প্রচুর দিয়েছে যাতে ওই সময়ে আমরা কিছু কিছু ব্যবসা করতে পারি—

দর্শনের অধ্যাপক রসুনেব ব্যবসা করিতে গিয়া ফেল পড়িয়াছেন, তিনি বলেন—ব্যবসা সকলের জন্য নয় হে! ব্যবসা আর বেদান্ত—ও দুটো বড় কঠিন জিনিস।

এমন সময়ে রামনাথবাবু ঘরে ঢোকেন।

সকলে বলেন—রামনাথবাবু আপনাব মত কি?

তিনি ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলেন—ঘণ্টা বেজে পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে, ক্লাস আছে।

রেজেস্ট্রী লইয়া রামনাথবাবু ক্লাসের দিকে যান।

সকলে এমনভাবে ঘড়িব দিকে তাকান, যেন ঘড়িটা এইমাত্র দেখিলেন। মনে মনে রামনাথবাবুর উপরে বিরক্ত হইয়া সকলে উঠিয়া পড়েন।

একজন অস্ফুট স্বরে বলেন—এত শীগ্‌গির ক্লাসে গেলে ছেলেরা ডিমরালাইজড্‌ হয়ে পড়বে যে!

ব্যবসা ও বেদান্ত বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে ভূতপূর্ব রসুনের ব্যবসায়ী, সম্প্রতি দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক এক ক্লাসে যাইতে আর এক ক্লাসে, আর এক ক্লাসে ঘুরিতে ঘুরিতে নিজের ক্লাসে

গিয়া যখন উপস্থিত হন—তখন কেবল রেজিস্ট্রিমাত্র করিবার সময় থাকে !

ব্যবসা ও বেদান্ত দুই-ই অতি কঠিন।

এই হেন কর্তব্যপরায়ণ রামনাথবাবুর চাকরি গেল। যাওয়া উচিত হয় নাই তাহা জানি, কিন্তু উচিতমতো কয়টা কাজ এ সংসারে হইয়া থাকে !

রামনাথবাবুর দোষ কি? আমি তো কিছু দেখি না, কিন্তু কর্তৃপক্ষের বিচারে চাকরির সেরা দোষ তিনি করিয়া বসিয়াছেন। রামনাথবাবু বেতনবৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন !

কর্তৃপক্ষ বলিলেন—দেখি কি করা যায়।

সহকর্মীরা একবাক্যে বলিলেন—আস্পর্ধা দেখ !

তখন সকলে বিশ বছর পরে, আবিষ্কার করিয়া ফেলিল রামনাথ-বাবু অধ্যাপনার একান্ত অযোগ্য !

কর্তৃপক্ষ বলিলেন—উনি ক্লাস ম্যানেজ করতে পারেন না—

মেজো কর্তৃপক্ষ বলিলেন—ওর গলার স্বর যথেষ্ট উঁচু নয়—

সেজো কর্তৃপক্ষ বলিলেন—ওঁর উচ্চারণ নেহাৎ সেকেলে—

সহকর্মীরা বলিলেন—সহকর্মী না হলে ওঁর সমস্ত দোষ খুলে বলতাম—

ভূতপূর্ব রসুন ব্যবসায়ী, সম্প্রতি দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নাকের দোনলা বন্দুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে নস্যের বারুদ পুরিতে পুরিতে বলিলেন—ওর বাড়ির ঝির সঙ্গে আমার আলাপ আছে কিনা—তোমরা জেনে রেখো আর বেশি দিন নয়—

সকলে জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপার কি?

তিনি বলিলেন—এত সহজ নয়—

ব্যবসা ও বেদান্ত দুই-ই দুরূহ।

এইরূপে সকলের, কর্তৃপক্ষ হইতে ঝাড়ুদারের ঐকতানের ফলে রামনাথবাবুর চাকরিটি গেল !

২

রামনাথবাবু মনের দুঃখে বনে গেলেন। এত স্থান থাকিতে বনে গেলেন কেন? কারণ প্রাইভেট কলেজগুলি এসংসারের সীমান্তে স্থাপিত—তার পরেই বনের আরম্ভ ! এই কলেজগুলিকে আধ্যাত্মিক শ্মশান বলিলেই চলে—এখানে আসিলে সবাই সমান। ছোট-বড়, ভালো-মন্দ, ধনী-নির্ধন, ছাত্র-অধ্যাপক কোন ভেদ এখানে নাই, আর অনির্বাণ যে চিতাগ্নি এখানে জ্বলিতেছে তাহাতে কাণ্ডজ্ঞানের সঙ্গে সরস্বতী নিরন্তর সহমরণে পুড়িতেছে !

আমাকে ভুল বুঝিবেন না। আমি অধ্যাপকদের নিন্দা করিতে বসি নাই। এই আধ্যাত্মিক শ্মশানে মুর্দাফরাসের কাজ করিতে করিতে অধ্যাপকেরা প্রত্যেকে এক একজন হরিশ্চন্দ্র হইয়া উঠিয়াছেন—তাঁহাদের গুণ বর্ণনার জন্যই কলম ধরিয়াছি। লোকের বিশ্বাস অধ্যাপকেরা ভালো মানুষ, অর্থাৎ আত্মরক্ষায় অক্ষম ; সত্যভীরু অর্থাৎ নিজের প্রয়োজন ছাড়া মিথ্যা কথা বলেন না ; বদান্য অর্থাৎ জিনিস কিনিয়া নগদ দাম দেন ; নিরীহ অর্থাৎ ছাত্রদের পার্সেণ্টেজ ছাড়া আর কিছু কাটেন না ; পক্ষপাতহীন অর্থাৎ দ্বিতীয়পক্ষ বিবাহ না করিয়া ক্ষান্ত হ'ন না ; উচ্চাকাঙ্ক্ষী অর্থাৎ দোতলা বাড়িকে তেতলায় পরিণত করিবার ইচ্ছা আছে ; পণ্ডিত অর্থাৎ বোধোদয় ও ফার্স্ট বুক নিশ্চয় পড়িয়াছেন।

কিন্তু কেহ কি জানে অধ্যাপনা করিতে করিতে ইঁহারা কি অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়াছেন? হাজার হাজার ছাত্রকে

পড়াইতে গিয়া যে বীরত্ব, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, রণকৌশল, বাগ্মিতা, কূটনীতি, সাহস, দুঃসাহস, প্রতিভা ইঁহারা প্রত্যহ দেখান তাহার ফলে অচিরকালের মধ্যে প্রত্যেকে যে যৌগিক ক্ষমতা লাভ করেন সংসারে তাহা যেমন দুর্লভ, তেমনি বিস্ময়কর।

এই গুপ্ত তথ্য কেহই জানে না, রামনাথবাবুও জানিতেন না। তিনি যখন বনে গেলেন ভাবিয়াছিলেন তাঁহার জীবন শেষ হইল—কেবল বিধাতাপুরুষ জানিতেন এবারে নূতন জীবন আরম্ভ হইল!

বনের মধ্যে দিয়া চলিতে চলিতে তিনি দেখিলেন অদূরে একটি ভীষণদর্শন ব্যাঘ্র বসিয়া আছে—একেবারে রয়াল বেঙ্গল টাইগার। রামনাথবাবু বিচলিত হইলেন—বাঘ শিকারের আশায় লেজ আছড়াইতে লাগিল। রামনাথবাবু থামিলেন, বাঘ লাফ দিবার জন্য দেহ সঙ্কুচিত করিল; তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শূন্যে লাফ দিল—আর ভীত-ত্রস্ত-ব্যাকুল-মুমূর্ষু রামনাথবাবুর মুখ দিয়া অজ্ঞাতসারে লক্ষবার উচ্চারিত অধ্যাপকদের ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ ছাত্রদের আতঙ্কস্বরূপ সেই বাক্য বাহির হইয়া পড়িল—হোয়াটস্ ইওর রোল?

রামনাথবাবু তারপরে কি হইল আর জানেন না—যখন মূর্ছা ভাঙ্গিল তখন দেখিলেন, তিনি শায়িত আর সেই ভীষণ বাঘটা তাঁহার পায়েব তলায় নিরীহ বিড়ালের মতো পড়িয়া আছে!

ব্যাপার কি? এ কেমন করিয়া সম্ভব হইল? বাঘটাকে দেখিয়া তিনি যত ভীত হইলেন, বাঘটা তাঁহাকে দেখিয়া তার চেয়ে বেশি ভীত হইল! আশ্চর্য ব্যাপার! তখন তাঁহার মনে হইল এতকাল অধ্যাপনা করিতে গিয়া নিশ্চয়ই কোন আধ্যাত্মিক শক্তি তিনি সঞ্চয় করিয়াছেন, যাহার ফলে বাঘ তাঁহার বশ হইয়াছে! না হইবেই বা কেন? বাংলা-দেশেব বাঘের চেয়ে সাহসী ছাত্রগণ যাঁহার বশীভূত, বাঘ তাঁহার কাছে কোন্ ছার!

তখন রামনাথবাবু বাঘটার গলায় চাদর বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া বাড়ি ফিরিলেন।

ইহার পরে গল্প সংক্ষিপ্ত।

ভূতপূর্ব অধ্যাপক রামনাথ চক্রবর্তী এখন বিখ্যাত প্রফেসার রামমূর্তি! তিনি সার্কাস পার্টি খুলিয়াছেন। সার্কাসের অন্যান্য খেলা শেষ হইলে তিনি একাকী নিরস্ত্র বন্য বাঘের খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করেন, দুর্দান্ত বাঘ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শূন্যে লাফ দেয়, তিনি দক্ষিণ হস্তের তর্জনী তুলিয়া জিজ্ঞাসা করেন—হোয়াটস্ ইওর রোল? অমনি সেই উদ্যত বাঘটা মূর্ছিতপ্রায় হইয়া ধপ্ করিয়া পড়িয়া যায়। ভীত দর্শকের দল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া হাততালি দিয়া উঠে।

কলেজের কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে 'পাস' চাহিয়া পাঠান, রামনাথবাবু 'মহৎ প্রতিহিংসায়' অনুপ্রাণিত হইয়া 'পাস' পাঠাইয়া দেন। ভূতপূর্ব সহকর্মীরা আসিলে প্রথম শ্রেণীর আসনে বসিতে পায়। রস্থন-দর্শন-বিজয়ী সেই অধ্যাপক সেই ব্যবসায়ে ঢুকিবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন; রামনাথবাবু বলিয়াছেন—ব্যবসা ও বেদান্ত দুই-ই বড় দুরূহ।

প্রফেসার রামমূর্তি আজ ধনে, মানে, প্রতিপত্তিতে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি; তাঁহার ভূতপূর্ব সহকর্মীরা অবসর সময়ে অর্থাৎ ক্লাসের ঘণ্টা পড়িলে তাঁহার বিষয়ে আলোচনা করিয়া নিজেদের গৌরবান্বিত বোধ করেন।

কেবল দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক এই আলোচনায় যোগ দেন না, তিনি তখন নিজের নাকের দোনলা বন্দুকে পরের নস্যের বারুদ নীরবে বসিয়া পুরিতে থাকেন।

আধ্যাত্মিক খোপা

পলাশপুরের যদুবাবুর ছোট ছেলেটি এবারে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে। বন্ধুরা যদুবাবুকে অভিনন্দন জানাইয়া বলিলেন—ছেলেকে পড়াও।

যদুবাবু দেয়ালে পতঙ্গের পশ্চাতে ধাবমান টিকটিকির লেজটির প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া বলিলেন—টাকা কোথায়?

বন্ধুরা বলিলেন—টাকা? সেজন্য ভাবলে চলবে না; জোতব্রহ্মত্র বেচে পড়াও; ঘটিবাটি বাঁধা রেখে পড়াও; সুদে আসলে উঠে আসবে; এ তো একেবারে 'সিওর উইন'।

উপদেশ দিয়া এবং টাকাপয়সার উপায় না'দিয়া বন্ধুরা প্রস্থান করিল। যদুবাবু বাড়ির ঘটিবাটির মানসাঙ্ক কষিতে লাগিলেন। টিকটিকিটা মাছিটাকে ধরিয়া প্রায় গ্রাস করিয়াছে।

বিকালবেলা যদুবাবুর নামে এক গোছা চিঠি আসিল। বন্ধুরা শুধাইল—কিহে ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ নাকি? ওটা মন্দ উপায় নয়, বিয়ে দিয়ে সেই টাকায় পড়াও।

বিবাহের সম্বন্ধ নয়। কলিকাতার পাঁচ-সাতটি কলেজ হইতে এবং মফঃস্বলের আট-দশটি কলেজ হইতে যদুবাবুকে অভিনন্দন করিয়া পত্র আসিয়াছে। কলেজের অধ্যক্ষেরা যদুবাবুকে নমস্কারান্তে জানাইয়াছেন যে, শ্রীমানের অভূতপূর্ব কৃতিত্বে বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল হইয়াছে; তাঁহারা শ্রীমানকে পড়াইবার ভার পাইলে গৌরববোধ করিবেন, ইত্যাদি। সর্বশেষে উল্লেখ আছে যে, শ্রীমান তাঁহাদের কলেজে ভর্তি হইলে টাকাপয়সার চিন্তা যদুবাবুকে করিতে হইবে না।

যদুবাবু কলিকাতার কুলীন কলেজের পত্রগুলি রাখিয়া মফঃস্বলের পত্রগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। যদুবাবুর তৈজসপত্র এ যাত্রা বাঁচিয়া গেল।

বন্ধুরা বলিলেন—কলেজগুলো প্রথমে যাচাই করে নিয়ো—কে কি দিতে চায় দেখে ভর্তি ক'রো, নইলে ঠকে মরবে।

বন্ধুরা যদুবাবুকে চিনিতে পারে নাই—নতুবা অস্থানে এমন উপদেশ দিত না।

তারপরে একদা শুভদিন দেখিয়া সপুত্রক যদুবাবু কলিকাতা রওনা হইলেন।

২

শিয়ালদহ স্টেশনে নামিতেই হোটেলের চাপরাশধারী আবদালীর মতো একপাল লোক যদুবাবু ও তাঁর পুত্রের উপরে আসিয়া পড়িল।

যদুবাবু শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন—আমরা হোটেলে উঠবো না।

ভিড়ের মধ্য হইতে একজন বলিল—হোটেল কোথায়? আমরা কলেজের লোক; দেখছেন না আমার চাপরাশে লেখা আছে বজ্রবাহু কলেজ! কেমন চকচকে চাপরাশ দেখছেন!

আর একজন তাকে ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—ওর চাপরাশ চকচকে মানে কি জানেন? নূতন কলেজ! আমার চাপরাশে দেখুন মরচে ধরেছে, মানে বনেদী কলেজ, বীরবাহু কলেজের নাম শোনেন নি! বাংলাদেশের বারো আনা গ্র্যাজুয়েট এই কলেজ থেকে বেরিয়েছে।

বজ্রবাহু হটিবার লোক নয়। সে বলিল—ওদের কলেজ নয়, হাট; ওখানে কি পড়া হয়, রামচন্দ্র! আমাদের কলেজে সাতজন প্রফেসার

পি-এইচ্. ডি, পনর জন পি. আর. এস, বার জন গোল্ড মেডালিস্ট ; ছাব্বিশ জনের কলকাতায় বাড়ি আছে—আর পঁয়ত্রিশ জনের ওজন আড়াই মণের উপর।

বীরবাহু হাসিয়া উঠিয়া বলিল—বিদ্যা হচ্ছে মাথার জিনিস—ওজন দিয়ে কি হবে ?

বজ্রবাহু তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল—ওজন দিয়ে কি হবে—শুনুন একবার কথা ! আমাদের কলেজের প্রফেসাররা মোটা মাইনে পায়, খায় দায় ভালো, তাই মোটা হয়েছে।

তারপরে সে গলার স্বর নামাইয়া বলিল—জানেন স্যার, ওদের কলেজের প্রিন্সিপ্যালের মৃগীরোগ আছে।

বীরবাহু প্রটেস্ট করিবার আগেই যদুবাবু বলিলেন—তাতে আমার কি ক্ষতি ?

বজ্রবাহু একটি ছাত্রমোহন হাসি হাসিয়া বলিল—ক্ষতি এই যে ওদের কলেজের প্রফেসারেরা চাকরি রাখবার জন্য মাঝে মাঝে মূর্ছা যায়। বুঝলেন না স্যার, প্রিন্সিপালের মৃগীরোগ থাকাতে কে কতবার মূর্ছা যায় সেই হিসাবে ওদের মাইনে বাড়ে। এখন আপনি বিচক্ষণ লোক বিবেচনা করে দেখুন, প্রফেসারেরা মূর্ছা গেলে ছাত্র পড়াবে কখন ?

এমন সময় 'ভারতবন্ধু' কলেজ অগ্রসর হইয়া বলিল—স্যার, আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমাদের কলেজে যারা চাকরি পায় না, তারাই ওসব কলেজে যায়।

যদুবাবু বলিলেন—আপনারা এখন যান, আমি বিবেচনা করে যেখানে খুশি যাবো।

ইহা শুনিয়া তিনজনেই সমস্বরে বলিল—এ তো ঠিক কথা—উনি বিবেচনা করে যাবেন।

এই বলিয়া তিনজনে পিতা-পুত্রকে ধরিয়া টানাটানি শুরু করিল।

'বীরবাহু' পিতাকে ধরিল, 'ভারতবন্ধু' পুত্রের হাত ধরিল, 'বজ্রবাহু' একেবারে শিকড় ধরিল অর্থাৎ পুত্রের দুই পা শক্ত করিয়া ধরিল। 'ভারতবন্ধু' হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল; বিষম টানে তার জামা খুলিয়া 'ভারতবন্ধুর' হাতে চলিয়া আসিল।

পুত্র কাঁদিয়া উঠিল—বাবা, আমার পিরাণ।

'বজ্রবাহু' অমনি পকেট হইতে একমুঠ লজেঞ্চুস বাহির করিয়া তাহার মুখে পুরিয়া দিয়া বলিল—খোকা, কেঁদো না, তোমাকে সিল্কের জামা তৈরী করে দেবো।

এই বলিয়া পুত্রকে কাঁধে ফেলিয়া সতীদেহবাহী পাগল মহাদেবের মতো দ্রুত ছুটিয়া আসিয়া একখানি ট্যাক্সিতে উঠিয়া পড়িল। অগত্যা যদুবাবুও সেই ট্যাক্সিতে উঠিলেন।

'ভারতবন্ধু' পুত্রের জামা ও 'বীরবাহু' পিতার সুটকেস লইয়া প্রস্থান করিল।

যদুবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলে 'বজ্রবাহু' হাসিয়া বলিল—সেজন্য চিন্তা করবেন না. সময়মতো সব ফিরে পাবেন।

ট্যাক্সি ছুটিল।

৩

বজ্রবাহু কলেজে এডমিশন বোর্ড বসিয়াছে। ছোট একটি ঘর, আলমারীর প্রাচীর সাজাইয়া সেটাকে ক্ষুদ্রতর করিয়া তোলা হইয়াছে। মাঝখানে একখানা বনেদী টেবিল অর্থাৎ অতিশয় পুরাতন ও জীর্ণ; চারপাশে কতকগুলি সজীব চেয়ার অর্থাৎ ছারপোকা-অধ্যুষিত; মাথার উপরে বিদ্যুতের পাখা এবং সেই পাখার নিচে এডমিশন

বোর্ডের মেম্বারদের মাথা। মেম্বারগণ সেই সব সজীব চেয়ারে সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তির মতো উপবিষ্ট।

সবচেয়ে ভালো গদি-আঁটা চেয়ারে যদুবাবু বসিয়া আছেন। তিনি পকেট হইতে একটি মরিচাধরা টিনের বাক্স বাহির করিয়া একটি বিড়ি বাহির করিলেন। অমনি 'এডমিশন বোর্ড' সমস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। সেই যিনি বজ্রবাহু কলেজের এজেণ্ট সাজিয়া স্টেশনে গিয়াছিলেন—এখন তিনি ভাগলপুরী সিল্কের জামা-চাদরে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত বেশে একখানি চেয়ারে আসীন। তিনি অর্থাৎ ভূমণ্ডলবাবু (পাঠক, আমি কি করিব, ওটা তাঁর পিতৃদত্ত নাম; পিতৃদত্ত নামের মাহাত্ম্য রক্ষার জন্য দর্জির বিল বাড়াইয়াও ক্রমশঃ তিনি ভূয়িষ্ঠ হইতেছেন।) একটি সিগারেটের বাক্স যদুবাবুর সম্মুখে আগাইয়া দিলেন। যদুবাবু নিজের টিনের বাক্স হইতে বিড়িগুলি বাহির করিয়া বাক্সের সব কয়টা সিগারেট তার মধ্যে সাজাইয়া রাখিয়া একটি ধরাইলেন।

যদুবাবু ইঙ্গিতে পাখা বন্ধ করিবার অনুরোধ করিয়া সিগারেট টানিতে লাগিলেন। ভূমণ্ডলবাবু শুধাইলেন—স্যার, পাখা বন্ধ কেন?

যদুবাবু বলিলেন—নইলে সিগারেট তাড়াতাড়ি পুড়ে যায়—পয়সা নষ্ট করে কি লাভ!

যদুবাবু যেন নিজের পয়সাতে কেনা সিগারেট টানিতেছেন! যদুবাবু জুন মাসের দুপুরবেলার বন্ধঘরে সিগারেট টানিতে লাগিলেন, আর বজ্রবাহু কলেজের এডমিশন বোর্ড বসিয়া ঘামিতে লাগিলেন।

পাঠক, তুমি ভাবিতেছ এতকাণ্ড যার জন্য যদুবাবুর সেই পুত্রটি কোথায়? মধু (যদুর পুত্র যে মধু হইবে ইহা জানিবার জন্য আশা করি মিলজ্ঞ কবি হইবার প্রয়োজন নাই) এখন রাহুগ্রস্ত শশিকলার মতো কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ক্রোড়ে আসীন।

সুপার (ওটা সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সংক্ষেপ—তাঁহার মাহিনা না কমাইয়াও কথাটাকে ছোট করিতে পারি!) শুধাইলেন—আচ্ছা বাবা, তোমাদের বাড়ির উত্তর দিকে একটা উঁচু টিলা আছে, নয়?

মধু বলিল—কই, না। উত্তর দিকে তো ধানক্ষেত।

সুপার বলিলেন—তারপরে?

মধু বলিল—তার পরে তো বিল।

সুপার বলিলেন—তারপরে?

মধু ভাবিয়া পাইল না তারপরে কি?

সুপার দুই চোখে স্নেহবৃষ্টি কবিয়া বলিলেন—কেন? হিমালয় পর্বতের কথা পড়নি?

মধু প্রবেশিকায় প্রথম হইয়াছে, সে বলিল—সে তো ভারতবর্ষের উত্তর দিকে।

সুপাব হাসিয়া বলিলেন—তবেই তোমার বাড়ির উত্তর দিকে হলো।

মধু তাঁহার বিদ্যার পরিধি দেখিয়া বিস্মিততর হইল—আগেই তাঁহার উদরেব পরিধি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে যদুবাবুর ধুমপান শেষ হইয়াছে, পাখা আবার ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এডমিশন বোর্ডের কপালেব ঘাম ও দুশ্চিন্তা দূরীভূত হইয়াছে।

তখন যদুবাবু কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া পকেট হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিলেন। চশমাটাকে ভালো করিয়া মুছিয়া নাকের খাঁজে বসাইয়া বলিলেন—তা হলে কি কি দিচ্ছেন?

সুপার তখন পুত্রকে ছাড়িয়া পিতার দিকে মন দিলেন।

তিনি বলিলেন—জানেন তো স্যার, কবীর সাহেব কি বলেছেন—

"সদ্‌গুরু পাওয়ে, ভেদবতাওয়ে,
জ্ঞান কর উপদেশ,
তব্‌ কয়লা কি ময়লা ছোড়ে,
যব্‌ আগ্‌ কর পরবেশ।"

এই বলিয়া তিনি তাঁর দুটি চোখকে দুটি সন্ধানী বাতির মতো যদুবাবুর চিত্তাকাশের দিকে নিক্ষেপ করিলেন—অতর্কিত প্রতিকূল-ভাবের বিমান আসিবামাত্র যাহাতে ধরা পড়ে।

তাঁর চোখের চশমার একটা খোঁপে কাচ আছে আর একটা শূন্য ; এক চোখে হাসি পিতার প্রতি নিক্ষিপ্ত, অন্য চোখে জল ফোঁটা ফোঁটা পুত্রের মাথায় পড়িতেছে ; এক চোখে দয়া, অন্য চোখে ধিক্কার ; এক চোখ চকোরের মতো সুধা প্রার্থনারত, আর এক চোখ চাতকেব মতো তৃষ্ণায় বুকফাটা ; এক চোখে শিব আর এক চোখে শিবানী। এইরূপে যুগল চোখের হরগৌরী-দৃষ্টি যদুবাবুর দিকে নিক্ষেপ করিয়া তিনি পাঁচ মিনিট ধরিয়া রহিলেন।

অন্যদিকে 'এডমিশন বোর্ড' আশা-আশঙ্কায় দণ্ড পল গুণিতে লাগিলেন। এডমিশন বোর্ডের নিকট সুপারের ওই দৃষ্টি কলেজের জাতীয় সম্পত্তি—কত আসন্ন বিপদ যে ওই দৃষ্টিতে কাটিয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। একবার জাঁদরেল এক D. P. I. কলেজ পর্যবেক্ষণে আসিয়া কি একটা গলদ যেন ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে ওই দৃষ্টি তাঁহার উপরে গিয়া পড়িল—সাহেব টলিতে টলিতে মোটরে গিয়া উঠিলেন—কথাটি পর্যন্ত বলিবার অবকাশ পাইলেন না।

পাঁচ মিনিট ঘর নিস্তব্ধ।

কিন্তু হায়, জগতে অজেয় বোধ করি কিছুই নাই। যদুবাবু কিনা

বলিয়া উঠিলেন—ওসব তো বুঝলাম, বিকালবেলা ফল খাবার জন্যে মাসে গোটা দশেক টাকা দিতেই হবে। বুঝলেন না, ফলের রস খেলে তবে তো মাথা ঠিক থাকবে।

হা হতোস্মি! এডমিশন বোর্ডের মেম্বারদের সমতালে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল—আর সেই সমবেত নিঃশ্বাসের বাতাসে দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারখানা কাঁপিয়া উঠিয়া ছবির মেয়েটার মুখে যেন বিদ্রূপের হাসি ফুটিল।

আর এই পরাজয়ে সুপারের আত্মগ্লানির চেয়ে শাস্ত্রগ্লানি অধিকতর হইল। তবে কি শাস্ত্র অভ্রান্ত নয়? নতুবা এদৃষ্টি তো ব্যর্থ হইবার নয়! বাড়ি ফিরিয়া একবার ঘেরণ্ড সংহিতাখানা দেখিতে হইবে—আর অমনি গুরুঠাকুরকেও প্রণামী পাঠাইয়া দিতে হইবে।

৪

পাঠক, ব্যাপার আর কিছুই নয়! আজ সেই বেলা দশটা হইতে—এখন বেলা পাঁচটা, এডমিশন বোর্ডের দরকষাকষি চলিতেছে। যদুবাবু বলিয়াছেন নিম্নলিখিতরূপ টাকা ও সুবিধা পাইলে তিনি মধুকে (যে অচিরকালের মধ্যে বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিবে) বজ্রবাহু কলেজে ভর্তি করিয়া দিতে পারেন!

(ক) মাসিক বৃত্তি—৩০৲ টাকা।

(খ) বই কিনিবার জন্য এককালীন—৯৩।৵০ আনা।

(গ) নূতন ধুতি জামা খরিদের জন্য—৫৩।০ আনা।

(ঘ) শিয়ালদহ স্টেশনে জিনিসপত্র খোয়া গিয়াছে, তার ক্ষতিপূরণ—১৫০৸৫ আনা।

(ঙ) যদুবাবুর একবারের যাতায়াতের খরচ—১৩।০ আনা।

(চ) যত্নবাবুর মাসে একবার করিয়া পুত্রকে দেখিতে আসিবার যাতায়াতী খরচ—ঐ।

(ছ) পুত্রের মাসিক হাতখরচ—১২॥০ আনা।

(জ) পিতার মাসিক কলিকাতায় আসাকালীন হোটেল খরচ দৈনিক ২।০ আনা হিসাবে।

(ঝ) মধুকে গ্রীষ্মাবকাশে দার্জিলিংএ এক মাস থাকিবার খরচ—১৫০৲।

(ঞ) ঐ যাতায়াতী খরচ—নূতন টাইমটেব্‌লে যে ভাড়া লিখিত থাকিবে তাহা।

(ট) পূজাবকাশে মধুকে পুরীতে একমাস রাখিবার খরচ ১৫০৲ টাকা।

(ঠ) তথায় যাতায়াতী ভাড়া—(ঞ) ধারায় লিখিত মতো।

(ড) বড়দিনের ছুটিতে ভারতবর্ষে cultural tour করিবার খরচ ২৫০৲ টাকা।

(ঢ) যত্নবাবুর সম্মানার্থ গরদের ধুতি চাদর এক জোড়া—২২॥০ আনা।

(ণ) মধুর বিকালবেলা ফল খাইবার বাবদ মাসিক ১০৲ টাকা।

এডমিশন বোর্ড ভাবিতেছেন—বাপ্‌রে কত লম্বা ফর্দ !

যত্নবাবু মনে মনে আক্ষেপ করিতেছেন—বর্ণমালার এখনো অনেকগুলি অক্ষর বাকি রহিয়া গেল।

গোলমাল বাধিয়াছে—মুর্দ্ধন্য ণকে লইয়া।

ভূমণ্ডলবাবু বলিলেন—স্যার, লেটেস্ট ওপিনিয়ন হচ্ছে যে, ফল খাওয়াটা শরীরের পক্ষে মোটেই অত্যাবশ্যক নয়।

যত্নবাবু কোন কথা না বলিয়া পকেট হইতে একখানা সচিত্র

খাদ্যতত্ত্ব বাহির করিয়া বিশেষ একটা অধ্যায় খুলিয়া ভূমণ্ডলবাবুর হাতে দিলেন ; বলিলেন—পড়ে দেখুন।

ভূমণ্ডলবাবু সচিত্র খাদ্যতত্ত্বের 'ফলাহার' অধ্যায় পড়িতে লাগিলেন।

যতুবাবু বলিলেন—বুঝলেন, এ এমন বেশি কিছু নয়, 'ভারতবন্ধু' কলেজ এমন কি খেন্তির বিবাহের সাহায্যবাবদও কিছু দিতে স্বীকার করেছিলেন।

তারপরে টীকা করিয়া বলিলেন—খেন্তি আমার ছোট মেয়ে। টীকার কোন প্রয়োজন ছিল না।—কিন্তু আমি ওখানে দিতে রাজী নই। ওখানে মেয়েরা পড়ে কিনা। জানেন তো ঘি আর আগুন—অর্থাৎ—

এই পর্যন্ত বলিয়া বিস্মৃত যৌবনের একটা মরচে-ধরা হাসি নিক্ষেপ করিয়া ভূমণ্ডলবাবুকে বলিলেন—আমরাও তো এক সময়ে যুবক ছিলাম—কি বলেন ?

ভূমণ্ডলবাবু তখন কমলালেবুর গুণ অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তিনি মুখ তুলিয়া শুধাইলেন—কি ?

যতুবাবু কিঞ্চিৎ ভুল করিয়াছেন। ভূমণ্ডলবাবু কখনো যুবক ছিলেন না। তিনি জন্মিয়াই মাস্টার—যাঁহারা জাত মাস্টার তাঁহাদেব কাছে জীবনের চরম বিভাগ সিনিয়ার ও জুনিয়াব : যৌবন, বার্ধক্য—ও সব কেবল মায়া।

জগতে এমন সহিষ্ণুতা নাই, যাহা অসীম : এডমিশন বোর্ডের সভ্যেরা মাস্টার হইলেও সজীব চেয়ারের তীব্র আক্রমণে তাঁহাদের ধৈর্য নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল। কর্ণ নাকি বজ্র-বৃশ্চিকের দংশন সহ্য করিয়াছিল, ছারপোকার আক্রমণ তাহাকে সহিতে হয় নাই—নতুবা মহাভারতের গতি অন্য রকম হইত !

এডমিশন বোর্ড যদুবাবুর 15 points স্বীকার করিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

তারপরে জলখাবার আসিল। যদুবাবু নিজের প্লেট শেষ করিয়া একে একে মেম্বারদের সকলের প্লেট শেষ করিয়া কেবল ঘরের চেয়ার-টেবিলগুলি বাদ রাখিয়া (যদুবাবু আবার নিরামিষাশী, তাই বোধ করি সজীব টেবিল-চেয়ার এ যাত্রা বাঁচিয়া গেল) উঠিয়া পড়িলেন। আর এডমিশন বোর্ড নিস্তব্ধ বিস্ময়ে যদুবাবুর great hunger লক্ষ্য করিয়া নিজেদের বর্তমান ও মধুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হইলেন!

সকলে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতেছেন—এমন সময়ে টেবিলের নিচ হইতে একটা সুবৃহৎ কুকুর বাহির হইয়া ছুটিয়া পালাইল।

একজন বলিল —ইস্, কত বড় কুকুর!

আর একজন বলিল—কি রকম লোম—যেন বিলিতি কম্বল!

তাঁহারা অন্য এক ঘরে গিয়া দেখিতে পাইলেন পাঁচ-সাত শত ছেলে কাগজ হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; আট-দশ জন কেরানী টেবিলে কি লিখিয়া চলিয়াছে। যদুবাবুর চোখে জিজ্ঞাসা ফুটিল।

ভূমণ্ডলবাবু বলিলেন—এরা আমাদের লক্ষ্মী অর্থাৎ পয়সা দিয়ে পড়বে। আর যে ঘরে আমরা ছিলাম, সে ঘরে সব সরস্বতী অর্থাৎ ভালো ছেলের দল—যারা পড়বে অথচ পয়সা দেবে না।

লক্ষ্মী-সরস্বতীর লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া যদুবাবু বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

৫

গভীর নিশীথে যদুবাবুর ঘরের দরজায় টোকা পড়িল তিনি দরজা খুলিয়া দিতেই 'বীরবাহু' কলেজে প্রবেশ করিলেন।

'বীরবাহু' বলিলেন—স্যার, আমরা কিন্তু 'ফ' পর্যন্ত দিতে রাজী আছি।

যদুবাবু শুধাইলেন—তার মানে ?

'বীববাহু' বলিলেন—ওরা 'ণ' পর্যন্ত concession দিয়েছে, আমবা তার পরে আরও কয়েক দফা জুড়ে দিয়ে 'ফ' পর্যন্ত যেতে সম্মত আছি।

যদুবাবু শুধাইলেন—আপনি 'ণ'র কথা কি করে জানলেন ?

এবারে 'বীরবাহু' হাসিলেন। দুর্যোধনেব মুকুট ছলনা করিয়া লইয়া আসিয়া যুধিষ্ঠির বোধ হয় এমনি করিয়া হাসিয়াছিল!

'বীরবাহু' বলিলেন—কুকুরটা দেখেছিলেন ?

যদুবাবু বলিলেন—হঁ্যা।

'বীরবাহু' বলিলেন—আমিই সেই কুকুর।

যদুবাবু বিস্ময়ের মুখ-ব্যাদানকে একটি হাই তোলাতে পরিণত করিয়া ফেলিলেন।

—তবে বলি, শুনুন স্যার, ওরা কি কি concessin দেবে জানবার জন্য আমি কাল রাত্রে একটা কুকুরের মেক-আপ করে গোপনে গিয়ে, টেবিলের নিচে বসেছিলাম—সব শুনে ফেলেছি।

যদুবাবু বলিলেন—কিন্তু কুকুর সাজলেন কি করে ?

'বীরবাহু' বলিলেন—আজকাল সিনেমার যুগে মেক-আপের কত উন্নতি হয়েছে। তা' ছাড়া এতে বিস্মিত হচ্ছেন কেন ? মানুষের কুকুর সাজা তো সহজ! কত কুকুর মেক-আপের জোরে মানুষ বলে চলে যাচ্ছে।

যদুবাবু বলিলেন—তা না হয় হলো! কিন্তু আপনারা শিক্ষক, আপনাদের এই নিচ কাজ কি করা উচিত ? আপনাদের উপরে ভার জাতিগঠনের—

জাতিগঠনের কথা শুনিয়া 'বীরবাহু' সেই জুন মাসের গভীররাত্রে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

যদুবাবু বলিলেন—কাঁদছেন কেন ?

'বীরবাহু' বলিলেন—বড় দুঃখে ! তবে শুনুন—এই বলিয়া তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—

জাতিগঠন কেউ চায় না—সকলেই চায় নিজের নিজের স্বার্থ। গভর্নমেন্ট চায় মন্ত্রিত্ব বজায় রাখতে, লীডারেরা চায় নিজের দল বজায় রাখতে, সাংবাদিক চায় কাগজের গ্রাহক-সংখ্যা ঠিক রাখতে, দেশের লোকে চায়—কি চায় জানি না, বোধ করি বিনা হাঙ্গামায় জীবনযাপন করতে ! কারো উপরে কোন ভার নেই—কারো কোন দায়িত্ব নেই—সব ভার এই মাস্টারদের উপর ?

যদুবাবু বলিলেন—আপনারা যা পারেন—করুন না !

'বীরবাহু' বলিলেন—না, ও রকম করে কিছু হয় না, হবার নয়। যে-ভার সকলে চেষ্টা করলে তবে বহন করা সম্ভব তা কেবল মাস্টারদের উপর ছেড়ে দিলে কেন চলবে ? আর সমাজে আমাদের কি কোন মর্যাদা আছে ? আমরা মন্ত্রী নই, লীডার নই, সাংবাদিক নই, খেলোয়াড় নই, সিনেমা-স্টার নই—এমন কি ছাত্রও নই।

গভর্নমেন্টের আমরা চক্ষুশূল, যেহেতু আমাদের জন্যই নাকি দেশে শিক্ষিতের (!) সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। লীডারেরা আমাদের ঘৃণা করে, সাংবাদিকরা আমাদের কৃপা করে, অভিভাবকেরা (মাহিনা না জানা পর্যন্ত) আমাদের সম্মান করে; আর ছাত্ররা আমাদের উপর এমন নিষ্করুণ যে, পরিপূর্ণ ধর্মঘটের দিনেও সব ছেলে ক্লাস ছেড়ে যায় না। দুই-চারজনের জন্য পূর্ণোদ্যমে আমাদের চীৎকার করে যেতে হয়, আর কলেজের কর্তৃপক্ষ আমাদের কি দৃষ্টিতে দেখেন তা এই অন্ধকারে বলতেও সাহস হচ্ছে না। কেবল যখন মাহিনা

বাড়াবার কথা বলি, তখন শুনি—এ প্রতিষ্ঠান নাকি আমাদেরই! আমাদের বেতন এতই কম যে, নিজের স্ত্রীর কাছেও বলতে লজ্জা বোধ করে! পেটে ক্ষুধা নিয়ে কি জাতিগঠন করা যায়? যারা নিজের উদরান্ন সংস্থান করতে অক্ষম, দেশের লোক তাদের উপর জাতিগঠনের ভার দিয়েছে। কি ভণ্ডামি! দেশের লোকের ভাবটা এই রকম যে, আমরা নিজের নিজের উন্নতি করি—তোমরা দুপুরবেলা আমাদের ছেলেমেয়েকে পড়াবার ছলে কলেজে আটকে রাখো—যেন তারা ট্রাম-বাস চাপা না পড়ে।

আমরা উদরান্নের জন্য কেউ দর্জির দোকান করি, কেউ বড়লোকের বাড়ি ম্যানেজারি করি, কেউ ওকালতি করি, কেউ গোরুর রাখাল ছাড়িয়ে দিয়ে নিজের গোরুর ঘাস নিজেই কাটি, আর যারা প্রাইভেট টিউশনের নামে ছাত্রের পিতার হাটবাজার করে তারা তো আমাদের মধ্যে নিতান্ত সাত্ত্বিক। দেশশুদ্ধ লোকের ময়লা কাপড় কাচার ভার আমাদের উপর—আমরা আধ্যাত্মিক ধোপা! এত ফাঁকি বিধাতা কি ভাবে সহ্য করবেন।···

এই বলিয়া তিনি কড়িকাঠের দিকে চাহিলেন—যেন বিধাতা ওখানে টিকটিকির মতো ছাদে লেপ্‌টিয়া বিরাজ করিতেছেন।

যদুবাবু বলিলেন—যা বলছেন তা মিথ্যা নয়। কিন্তু আপনাদের কলেজে তো এমন রেষারেষি থাকা উচিত নয়!

উচিত নয় বুঝি!—'বীরবাহু' বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু ক্ষুধিতের কি তত্ত্বজ্ঞান আছে? ছাত্রসংখ্যার উপরে যেখানে মাস্টারদের বেতন নির্ভর করে—সেখানে কাণ্ডজ্ঞান, ভদ্রতা, সৌজন্য—এসব কথা বাতুলতা মাত্র! একটি ছাত্রকে যদি ভালো করে পাস করাতে পারি, তা দেখে হাজার হাজার ছাত্র আসবে, দেওয়ালীর রাতের পতঙ্গের মতো একটি উজ্জ্বল দীপশিখাকে লক্ষ্য করে। এসব উচিত নয়, অন্যায়

অনৈতিক সবই জানি। কিন্তু ক্ষুধা যে নিয়মিত দুই বেলা পায়; আসন্ন বিবাহ-যোগ্য মেয়ের বয়স যে দাড়ির মতো বিনা সাধনাতেই বেড়ে চলে, পুত্রকন্যার কঠিন ব্যাধিতে মৃত্যুভীতির চেয়ে অর্থচিন্তা প্রবলতর হয়। আব কিছুদিন বাদে দেখবেন চা-বাগানের আড়কাঠির মতো কলেজের এজেণ্ট দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে, গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে দাদন করে আসবে। স্বার্থপর ব্যবহারের জন্য যদি দেশের আর কাউকে দোষ না দেন—তবে শুধু মাস্টারদের দোষ দিলে কেন চলবে? তারা তো মানুষ, ক্ষুধিত মানুষ—A hungry nation has no philosophy!—এই পর্যন্ত বলিয়া 'বীরবাহু' থামিলেন।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া যদুবাবু বলিলেন—আপনাদের 'ফ' ও ওঁদের 'ণ'—দুইই থাক।

—তার মানে?

যদুবাবু বলিলেন—ছেলেকে পড়াবো না।

'বীরবাহু' লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—সে কি? তবে কি করাবেন?

যদুবাবু বলিলেন—পৈতৃক কিছু ব্রহ্মত্র আছে—তাই গিয়ে চাষ করবে!

'বীরবাহু' বলিলেন —তাতেও যে পয়সা লাগবে?

যদুবাবু বলিলেন—কিছু ঘটিবাটি এখনো আছে।

'বীরবাহু' বলিলেন, যেন আপন মনেই—ম্যাট্রিকুলেশনে ফার্স্ট-হওয়া ছেলে কলেজে না পড়ে শেষে চাষ করবে! কি সর্বনাশ—দেশের হলো কি?

যদুবাবু বলিলেন—যদি কিছু মনে না করেন তবে বলি, আপনিও আমার সঙ্গে চলুন—

—কেন?

আপনাকে কিছু জমি দেবো—চাষ করবেন।

—চাষ করবো ?—'বীরবাহু' লাফাইয়া উঠিলেন, এতক্ষণে তাহার আত্মমর্যাদাবোধ ফিরিয়া আসিল। তিনি ক্রোধে, বিস্ময়ে, ক্ষোভে, ধিক্কারে বলিতে লাগিলেন—আপনি কি মনে করেন ? আমি চাষ করবো ? আমি হবো চাষা ? আমি কাল্‌চারের পথ ছেড়ে এগ্রিকাল্‌চার ধরবো ? কৃষ্টি ছেড়ে ধরবো কর্ষণ ? ধিক্ !

বিস্মিত যদুবাবু বলিলেন—কিন্তু এত অপমান সহ্য করে—

—অপমান ?—'বীরবাহু' বলিতে লাগিলেন—না হয় দুটো কথা এখানে শুনতে হয়—কিন্তু তা বলে চাষা হতে পারিনে।—এই বলিয়া তিনি যদুবাবুর প্রতি একটা ধিক্কারের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যাইবার সময় যেন ভুল করিয়াই যদুবাবুর সিগারেটের কৌটাটা হাতে করিয়া লইয়া গেলেন।

*　　　*　　　*

যদুবাবু তখনি নিদ্রিত পুত্রকে ঠেলিয়া জাগাইয়া বিছানাপত্র বাঁধিয়া রওনা হইলেন। অত রাত্রে ট্রেন নাই—তবু তিনি স্টেশনে গিয়া বসিয়া থাকা স্থির করিলেন। কি জানি ভোর হইবামাত্র যদি আবার কলেজের এজেন্টরা আসিয়া উপস্থিত হয়।

ঘুমের ঘোরে মধু জিজ্ঞাসা করিল—বাবা, এবারে কোন্ কলেজ ?

চাষের নাম শুনিয়া পাছে ছেলে আপত্তি করে তাই তিনি বলিলেন—এগ্রিকাল্‌চারাল কলেজ !

গভীর রাত্রে সপুত্রক যদুবাবু হোটেল ত্যাগ করিলেন, ম্যানেজার ঘুমাইতেছিল, কাজেই বিল শোধ আর করিতে হইল না।

পরদিন তাঁহারা পলাশপুরে গিয়া পৌঁছিলেন। যদুবাবুর তৈজস-পত্রের দুর্ভাগ্য—এ যাত্রা তাহারা রক্ষা পাইল না !

উতঙ্ক

কোন এক কলেজে আমার এক বন্ধু অধ্যাপক। মাঝে মাঝে তাহার কাছে যাই—অধ্যাপকদের অনেকের সঙ্গেই আলাপ হইয়াছে, মুখচেনা পরিচয় সকলের সঙ্গেই আছে।

সেদিন কলেজে গিয়া দেখিলাম বন্ধুটি ক্লাসে গিয়াছেন, কাজেই অধ্যাপকদের ঘরে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

দর্শন-Cum-ধর্মনীতিব অধ্যাপক নাকে প্রচুর পরিমাণে নস্য ঠাসিয়া দিয়া বলিলেন—নাঃ, আজকাল্‌কাব ছাত্রদেব না আছে পড়া-শুনায় মন, না আছে তেমন গুরুভক্তি!

এই বলিয়া পাশের অধ্যাপকের দিকে মুখ ফিবাইতেই দক্ষিণা বাতাসে যেমন ফুলের পরাগ ঝরিয়া পড়ে, তেমনি তীব্র নস্যের গুঁড়া ভদ্রলোকটির নাকে গিয়া ঢুকিল।

তিনি সশব্দে হাঁচিয়া উঠিলেন—হ্যাচ্চ।

কিন্তু এই তুচ্ছ বাধাতে বিব্রত হইবার লোক পূর্বোক্ত অধ্যাপক নন; তিনি পূর্বকথার সূত্র ধরিয়া বলিলেন—কিহে মনে আছে তো আরুণি, উতঙ্ক, ওদের কথা?

ভদ্রলোক আর একটি হাঁচি দিবার জন্য মুখ ব্যাদান করিয়াছিলেন, কিন্তু সহসা, বোধ কবি উতঙ্ক ও আরুণির কথা মনে পড়িয়া অসমাপ্ত হাঁচিটা রুমালে চাপিয়া দিলেন।

বুঝিলাম ইঁহারা সকলেই ধৌম্য, পরাশর, জাবালির ন্যায় আদর্শ গুরু—কেবল উপযুক্ত শিষ্যের অভাবেই প্রতিভার স্ফূর্তি হইতেছে না।

২

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে সেই অধ্যাপকবাবুর সঙ্গে বৈঠকখানা বাজারের পাশ দিয়া যাইতেছিলাম, হঠাৎ দেখিলাম একজন যুবক বন্ধুকে নমস্কাব করিয়া দাঁড়াইল। দুই হাত কপালে ঠেকাইবার সময় তাহার বাজারের দোদুল্যমান ঝুলির মধ্যে সোয়া সের বেগুন ও কিঞ্চিৎ পলাণ্ডু দুলিতেছিল।

বন্ধু শুধাইলেন—খবর কি?

ছাত্রটি বলিল—স্যার, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্বের সাব্‌সট্যান্সটা একটু যদি···

বুঝিলাম বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্ব রচনা সার্থক হইয়াছে—নতুবা বাজার করিয়া ফিরিতে এমন জিজ্ঞাসার উদ্ভব সম্ভব হইত না।

বন্ধু বলিলেন—আর এক সময়ে হবে।

ছাত্রটি নমস্কার করিবার সময়ে নাকের কাছে সোয়া সের বেগুনেব থলিটি পুনরায় দোলাইয়া বলিল—আজ্ঞে, তাই হবে।

কিঞ্চিৎ দূবে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্যাপার কি?

বন্ধু একবার পিছন ফিরিয়া লইয়া বলিলেন—আর বল কেন? ছেলেটা আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। যখন তখন যেখানে সেখানে পাঠ্যবিষয়ের প্রসঙ্গ তুলে বসে। সেদিন দেখি ফুটবল খেলার মাঠে কখন্ পাশে এসে বসেছে। বলে কিনা স্পোর্টস্ সম্বন্ধে Essay আসতে পারে—তাই খেলা দেখতে এসেছে। সারাক্ষণ ধরে কেবলি জিজ্ঞাসা করে—স্যার, কয়েকটা Point বলে দিন। খেলা দেখা একদম মাটি করে দিল!

আমি বলিলাম—সেজন্য দুঃখ কর কেন? তোমরাই তো সেদিন দুঃখ করছিলে যে আজকাল আর উতঙ্কের মতো ছাত্র পাওয়া যায় না।

বন্ধু বলিলেন—যা বলেছেন। আমরা ঠাট্টা করে নিজেদের মধ্যে ওকে উতঙ্ক বলেই উল্লেখ করি।

তারপর বন্ধুর কাছে উতঙ্কের জ্ঞানস্পৃহার অনেক ঘটনা শুনিয়াছি। সে যুগের উতঙ্ক ইহার কাছে অনেক কিছু শিখিতে পারিত।

উতঙ্ক প্রফেসারদের রুমে কোন প্রফেসারকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ দেয় না।

মনে করুন আ-বাবু পর পর তিন পর্ব ক্লাস করিয়া আসিয়া পাখা খুলিয়া দিয়া বসিয়াছেন অমনি স্মিতবদন উতঙ্ক আসিয়া বলিল—স্যাব, ওয়ার্ডস্বার্থের সেই কবিতাটা ?

আ-বাবুর তখনি মনে পড়িয়া গেল জীবন বীমার কিস্তি দিবাব আজ শেষ তারিখ, তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

ইহাতে উতঙ্কের দুঃখ নাই—জ্ঞানের বিষয় যেমন অনন্ত, প্রফেসাবও তেমনি অনেক।

সে র-বাবুর কাছে গিয়া বলিল—স্যার, গীতার এই শ্লোকটা একবার দেখুন।

র-বাবুর বাড়িতে গোরু আছে। তিনি গোরুর জন্য স্বহস্তে আড়াই হাজার খড় কুটিয়া কলেজে আসিয়াছেন, তখনও গো-প্রীতির ধাক্কা সামলাইতে পারেন নাই। তিনি জামার সাড়ে তিন পকেট (পাঞ্জাবীব ৩টা, ফতুয়ার ১টা ছোট) খুঁজিয়া চশমা পাইলেন না, কাজেই গীতার শ্লোকটি আর—

উতঙ্ক অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—আচ্ছা থাক, আর এক সময়ে হবে।

সে গুটি-গুটি ইতিহাসের অধ্যাপক বি-বাবুর দিকে বওনা হইল।

বি-বাবু উতঙ্ককে দেখিয়াই জগতের যত গাম্ভীর্য মুখমণ্ডলে লিপ্ত করিয়া বসিলেন।

উতঙ্ক তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল—স্যার, বাড়িতে সব খবর ভালো তো ?

বি-বাবু বাড়ির অদ্ভুত উদ্বেগে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন—বড় খারাপ, এখনই যেতে হবে।

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন। সেদিন আর তাঁহার ক্লাস লওয়া হইল না। বি-বাবু ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন—বাড়িতে গিয়াই একখানা ক্যাশুয়াল লীভের দরখাস্ত পাঠাইয়া দিতে হইবে।

এদিকে উতঙ্ক ক্রমে গণিত, অর্থনীতি প্রভৃতির অধ্যাপকদের বিব্রত করিয়া দর্শন-Cum-ধর্মনীতির অধ্যাপকের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল।

উতঙ্ক বলিল—স্যার, শঙ্কর—

তাহার কথা আর শেষ হইতে পারিল না। দার্শনিক অধ্যাপক ফুকারিয়া উঠিলেন—আছে, আছে, সব আছে।

এই বলিয়া পকেট হইতে পঞ্চাশ পৃষ্ঠাব্যাপী এক দর্শনের প্রবন্ধ বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন আর উতঙ্ক ঠায় দাঁড়াইয়া শুনিয়া যাইতে লাগিল।

যেমন্ গুরুর উৎসাহ, তেমনি শিষ্যের ধৈর্য ! আড়াই ঘণ্টা পরে প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে গুরু শুধালেন—কেমন ?

উতঙ্ক বলিল—ভালোই। তবে আপনি যে শঙ্করের কথা বললেন—

অধ্যাপক রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন—ইউরোপের পণ্ডিতদের কথা ছেড়ে দাও। এক শঙ্কর ছাড়া দ্বিতীয় শঙ্কর নেই—অষ্টম শতাব্দীর গোড়াতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

উতঙ্ক বলিল—সে কি স্যার, শঙ্কর যে এখনো বেঁচে আছে—আমাদের খেলার সেক্রেটারি শঙ্কর ঘোষ।

অধ্যাপক চীৎকার করিয়া উঠিলেন—(স্বকীয় ভাষা এবং রোমশ বক্ষঃস্থল বাহির হইয়া পড়িল)—খেল্‌বা, খেল্‌বা, কিছু তো বোঝবা না। বোঝবা কেম্‌নে! অহোহ ইণ্ডিয়ান কাল্‌চারটার বেবাক্ নাশ করে ফেল্‌লা: ওহে দাও তো একটিপ নস্য!

একবার এ পাশে তাকাইলেন—কেহ নাই, ওপাশে তাকাইলেন—কেহ নাই, সম্মুখে কেহ নাই, ঘরের মধ্যে কেহ কোথাও নাই। গুরু-শিষ্য সংবাদের মাঝখানে অন্যান্য অধ্যাপকরা প্রাণ লইয়া সরিয়া পড়িয়াছেন—কেবল পিছনে অনুতপ্ত উতঙ্ক নম্রশিরে দাঁড়াইয়া আছে।

৩

উতঙ্ক আন্তঃকলেজ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। কলিকাতায় এমন কলেজ নাই যেখানে তার গতিবিধি না আছে। এমন অধ্যাপক নাই যার কাছে একাধিকবার সে না গিয়াছে; পাছে ভুল হয় তাই একখানি নোটবুকে খ্যাতনামা অধ্যাপকদের বাড়ির ঠিকানা টুকিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা নাই। অবশেষে আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট উতঙ্ক খাস বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত আরম্ভ করিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা তো আর ছাত্রবেতনে পরিচালিত আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট কলেজের স্বল্প বেতনের অধ্যাপক নন—তাঁহাদের যেমন মেদ তেমনি মেধা, যেমন বিদ্যা তেমনি বেতন, যেমন দায়িত্ব তেমনি দেনা, যেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা তেমনি বাড়ির উচ্চতা—সংক্ষেপে তাঁহারা জাতিগঠনে নিরত—আর কলেজের অধ্যাপকরা তো কেবল ছাত্র পাস করায়; ধিক্। অবশ্য সেই ছাত্রদের পরীক্ষার ফি-র উপরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের অস্তিত্বের নির্ভর।

এ হেন সরস্বতীর বড় মন্দিরে উতঙ্ক একদিন গিয়া উপস্থিত হইল। পাখা খুলিয়া দিয়া আরাম-কেদারায় এক অধ্যাপক টান হইয়া পড়িয়া ছিলেন—অধ্যাপনা ও ভোজনান্তে তিনি সাতিশয় ক্লান্ত।

উতঙ্ক বলিল—স্যার,—

অধ্যাপক বলিলেন—কি, চাঁদা নাকি?

উতঙ্ক বলিল—না ব্লেকের সেই কবিতাটা—

—কোন্ কলেজের ছাত্র?

কলেজেব নাম শুনিয়া অধ্যাপক বলিলেন—বি. এ. পাস করে এখানে এসে ভর্তি হয়ো, তখন দেখা যাবে।—এই বলিয়া তিনি পাশ ফিবিলেন, বলিষ্ঠ সেগুন কাষ্ঠের চেয়াব মচমচ্ করিয়া উঠিল।

ছাত্র-সমাজে উতঙ্কের অসীম প্রতিষ্ঠা। কোন কলেজের ধর্মঘট করিতে হইলে ছাত্রেরা উতঙ্ককে Requisition করে। উতঙ্ক কলেজে ঢুকিতেই অধ্যাপকরা আতঙ্কে পলায়ন করে, কলেজ আপনি ছুটি হইয়া যায়—Strike successful হয়।

পরীক্ষা আসিয়া পড়িয়াছে—বাংলাদেশ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। নূতন পটল ও পরীক্ষার suggestion চড়া দরে বিক্রয় হইতেছে। পথের মোড়ে হকারেরা রেস ও ম্যাট্রিক পরীক্ষার Tip হাঁকিতেছে। পিতারা রেসের ও পুত্রেরা পরীক্ষাব Tip সংগ্রহ করিতেছে। উভয় দলেবই ভবিষ্যৎ সমান উজ্জ্বল!

এই সময়ে—কলেজের বিশিষ্ট অধ্যাপকের মৃত্যু হইল। মুমূর্ষু অবস্থায় সজ্ঞানে তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইল—আমরা অনেকে সঙ্গে গেলাম। গঙ্গাজলে অর্ধনিমগ্ন অবস্থায় তিনি ইষ্টনাম জপ করিতেছেন। যে-কোন মুহূর্তে প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইতে পারে।

এমন সময়ে দেখিলাম ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া উতঙ্ক আসিতেছে।

বেচারী নিশ্চয় অধ্যাপকের কাছে নানা ভাবে ঋণী—হয়তো দেখিতে পাইবে না আশঙ্কা করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। আর এমন ছাত্র-প্রিয় অধ্যাপক, ছাত্ররা কেনই বা না ছুটিবে!

আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম—এখনো আছেন, ভয় নেই।

উতঙ্ক বলিল—নাঃ ভগবান আছেন!

উতঙ্ক কাছে আসিয়া শুধাইল—কোথায়?

দেখাইয়া দিলাম।

অধ্যাপকের তখন শেষ মুহূর্ত। উতঙ্ক কাছে যাইতেই সকলে অবচেতন ভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তাহার সেদিকে দৃষ্টি নাই। সে অধ্যাপকের মুখের কাছে নত হইয়া বসিল। তিনি তখন রামনাম জপ করিতেছিলেন, উতঙ্ককে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া শুধাইলেন—কি?

উতঙ্ক বলিল—স্যার, ওয়ার্ডস্বার্থের সেই কবিতাটা—ওই যে সেই লণ্ডন, ১৮০২—ওটার কিছু Suggestion?

আমরা সকলে 'হায় হায়' করিয়া উঠিলাম। অধ্যাপকের মুখ ঈষৎ ফাঁক হইল, যেন কি বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—কিন্তু ওষ্ঠাধর আবার বন্ধ হইল, চক্ষুতারকা স্থির হইয়া গেল—প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

উতঙ্ক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—Too late! Too late! তারপর সখেদে নিজের মনে বলিতে বলিতে প্রস্থান করিল—"Professor thou shouldst be living at this hour! Students have need of thee!"

সকলে তাহার উপরে অত্যন্ত বিরক্ত হইল; কিন্তু আমি মনে মনে বলিলাম—ধন্য উতঙ্ক তোমার জ্ঞানস্পৃহা! তোমার উদাহরণ দেখিয়াই বাঙালী অধ্যাপকদের চৈতন্যের অর্ধচন্দ্রোদয় সম্ভব হইয়াছে।

গণক

এপ্রিল মাসের কলিকাতা শহর। দুপুরের রোদে রাস্তার পিচ গলিয়া জুতার ছাপ বসিয়া যাইতেছে। পথে লোকজন নাই। ট্রাম-বাসের চলাচল কমিয়া আসিয়াছে; মাঝে মাঝে একখানা জলঢালা ট্রামগাড়ি লাইনের উপর জল ঢালিয়া চলিয়া যাইতেছে—তৃষিত কুকুরটা আসিয়া পৌঁছিবার আগেই সে জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। পথের পাশের জলের কলের সঙ্কীর্ণ ছায়াতে একটা কুকুর জিহ্বা বাহির করিয়া পড়িয়া আছে। রোদের দিকে চাহিলে চোখে জ্বালা ধরিয়া যায়।

এমন সময়ে ওই লোকটি কোথায় চলিয়াছে? নিশ্চয় কোন গুরুতর বিপদে পড়িয়াছে, নহিলে শখ করিয়া কে পথে বাহির হয়! হয়তো বাড়িতে ব্যাধি আটিয়া উঠিয়াছে, কিংবা হয়তো হঠাৎ মনে পড়িয়াছে বেলা ৩টার মধ্যে জীবনবীমার কিস্তি দাখিল করিতে না পারিলে তামাদি হইবে; নতুবা এহেন অবস্থায় কে বাহির হয়!

লোকটা কাছে আসিলে দেখা গেল মুখে শঙ্কার ছাপ নাই, বরঞ্চ একটা লাভলোলুপ কৌতূহলের ভাব। সে ভেজা গামছাখানি মাথা হইতে নামাইয়া মুখটা মুছিয়া লইল; গামছা যেমন দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া যাইতেছে—তেমনি আবার দেখিতে দেখিতে ঘামে ভিজিয়া উঠিতেছে।

এমন সময়ে লোকটি থম্‌কিয়া দাঁড়াইল; মুখের প্রসন্নতা কোথায় গেল! অদূরে কার দিকে তাকাইয়া দৃষ্টি অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল? ব্যাপার কি? অদূরে আর একজন লোক ভেজা গামছা মাথায় এইদিকে আসিতেছে।

দ্বিতীয় লোকটি কাছে আসিয়া পড়িলে প্রথম ব্যক্তি শুধাইল—কি ইস্কুল পালিয়ে নাকি ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—একরকম তাই, 'এই আসছি' বলে সরে পড়েছি। আপনি ?

প্রথম ব্যক্তি বলিল—আর বল কেন ভাই ? বাড়িতে কঠিন ব্যামো, কিছুতেই বেরুতে দেয় না ; শেষে ডাক্তার ডাকবার নাম করে, বুঝলে কিনা !

—চলুন, চলুন। নইলে আবার সেই টেকো-টা এসে পড়বে।

প্রথম বলিল—কিন্তু সেই দাঁতপড়াকে ঠকাবে কি করে ? এতক্ষণে দুই হাজার গুণে ফেলেছে।

—তবে তাড়াতাড়ি চলুন।

তখন দুইজনে পরস্পরের মিলনে অত্যন্ত অপ্রসন্নচিত্তে এবং টেকো ও দাঁতপড়ার ভয়ে শঙ্কিত মনে চোখে অগ্নিবর্ষণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই কলের ছায়ায় শোয়া কুকুরটা হঠাৎ' তাদের চোখের দিকে তাকাইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল এবং ছুটিতে ছুটিতে গিয়া ট্রামের খুঁটির ছায়াতে দণ্ডায়মান কর্পোরেশনের একটা ষাঁড়ের পেটের তলের ছায়ায় বসিয়া পড়িয়া ধুঁকিতে লাগিল।

২

পাঠক, এই দুই ব্যক্তিকে চেনো কি ? চেনো না ! পরীক্ষাজীবী বাংলাদেশের একটি বৃহৎ অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা হইয়া গেলে চঞ্চল হইয়া ওঠে।

প্রথমে ঠেলাগাড়িওয়ালারা চঞ্চল হয়—রাশি রাশি বেঞ্চি টেবিল বহন করিবার আশায় ; তারপরে দপ্তরীরা, কেরানীরা, অফিসের

বাবুরা,—নানা রকম প্রয়োজনে ; আদালতের উকীলেরা—পরীক্ষা-গৃহে 'গার্ড' দিবার জন্য (উকীলদের নিন্দা করিতেছি না ; শাস্ত্রেই বলিয়াছে পুরুষস্য ভাগ্যং। বাঙালীর অদৃষ্টের দুই মেরু, দারোয়ানী ও মন্ত্রিত্ব ; একটু অদল বদলে কত প্রভেদ) ; তারপরে অভিভাবকদের দল, পরীক্ষকের দল, সবশেষে ছাত্রের দল, পরীক্ষা শেষ হইবামাত্র নম্বর জানিবার জন্য উমেদারের দল : তাহারা প্রায়ই নিরাশ হয় না—যদিচ পরীক্ষার নম্বর বলিবার হুকুম নাই—তাহা strictly confidential ; কিন্তু পরীক্ষকরা মর্মজ্ঞ, তাঁহারা জানেন যে strictly confidential মানেই 'অসঙ্কোচে বলিয়া দিবে'—এবং একেবারে অন্তিমদৃশ্যে ঢাকুরিয়া লেকের মাছের দল—পরীক্ষার ফল বাহির হইলে যখন ফেল-করা সন্তান সেনার দল ঝাঁকে ঝাঁকে লেকে ঝাঁপ দিয়া দেহত্যাগ করে—'যোগাতে মাছের খাদ্য'।

সম্প্রতি একটি নূতন দল সৃষ্টি হইয়াছে—এঁদের নাম গণক। পরীক্ষার খাতা দেখা হইয়া গেলে ইহারা নম্বরগুলি মিলাইয়া দেখেন, যোগফলে ঠিক আছে কিনা। খাতাপ্রতি দক্ষিণা হয়তো আধ পয়সা কি পৌনে এক পয়সা। কিন্তু এমনি ইহাদের অধ্যবসায় যে তিলে তাল করিয়া কেহ দেড়শ', কেহ দুইশ' টাকা রোজগার করেন! বাঙালী এখনো নিজের জাতীয় বীরদের না চিনিয়া বৃথা রবার্ট ব্রুস প্রভৃতি বিদেশীর নাম করিয়া থাকে।

এই গণকদের অসাধ্য বলিয়া কিছু নাই। কাঠফাটা রোদ, গভীর রাত্রি, মুমূর্ষুর শয্যা, ইস্কুলের বিধান কিছুতেই ইহাদের নিরস্ত করিতে পারে না। যারা হেড এগজামিনারের বাড়ির কাছে থাকে তারা বোধ করি নিজেদের স্বর্গের অধিবাসী মনে করে। তেল মাখিতে মাখিতে ক-বাবু আসিয়া বলিলেন—স্যার, এই একবার এলাম। আছে নাকি কাগজ? আছে? দিন, দু' পুঁটলী গুণে যাই।

দু' পুঁটলী গুণিয়া, তৈলাক্ত মস্তক স্নিগ্ধ করিয়া সস্নিগ্ধ গোয়ালার দুধের বিলের কিছুটা সুরাহা করিয়া ক-বাবু গঙ্গাস্নানে প্রস্থান করিলেন।

খ-বাবু বড়বাজার হইতে কিছু 'খট্‌মলের' কিনা ছারপোকার অঙ্কুর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পরীক্ষা আরম্ভ হইবামাত্র সেগুলি তিনি নিজের শয্যায় ছাড়িয়া দিয়াছেন—এতদিনে তাহারা সাবালক হইয়া দংশন শুরু করিয়াছে; মাঝরাতে খ-বাবুকে ঘুম ভাঙাইয়া জাগাইয়া দেয়। তিনি এলার্ম ঘড়িতে বিশ্বাস করেন না—হাজার হোক তা মানুষের তৈয়ারী—আর এ একেবারে স্বয়ং ভগবানের সৃষ্টি। খ-বাবু হেড এগজামিনারের বাড়িতে আসিয়া কড়া নাড়িয়া দরজা খুলিতে বাধ্য করিয়া গণনায় বসিলেন। মেয়ের বিবাহের টাকা জমাইতেছেন। মেয়ে সদ্যোজাত। সে কালক্রমে তিলে তিলে তিলোত্তমা হইবে, অমনি সেই সঙ্গে বছরে বছরে গণনার টাকা তিলে তিলে তাল হইয়া উঠিবে। খ-বাবু গণিতের এম. এ.; বি. এ.-তে অর্থনীতিতে অনার্স পাইয়াছিলেন।

৩

ইত্যবসরে প্রথম বাবু ও দ্বিতীয় বাবু (এখন বাবু বলা যাক) হেড এগজামিনারের বাড়িতে পৌঁছিয়া অস্ত্রাগারে (অর্থাৎ যে ঘরে পরীক্ষার খাতা থাকে) গিয়া পৌঁছিলেন। টেকো ও দাঁতপড়া আসে নাই দেখিয়া এবং অগণিত অনেক খাতার স্তূপ দেখিয়া দু'জনের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দু'জনে ছুটিয়া গিয়া যতগুলি সম্ভব (এঁদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়) পুঁটলী লইয়া বসিয়া পড়িলেন। প্রথম বাবুর বয়স ষাট, দ্বিতীয় বাবুর পঞ্চাশ।

দু'জনে নিঃশব্দে মনে মনে গণনা করিয়া চলিলেন; ৩ আর ২ পাঁচ আর ৪ নয়, আর তা সাড়ে বার ইত্যাদি।

এমন সময় ঘরের এক কোণ হইতে শব্দ হইল—চুন না সুরকি?

দু'জনে চমকিয়া উঠিলেন—লোক নাই, কথা বলে কে?

এক মুহূর্ত পরে সু-উচ্চ খাতার প্রাচীরের মধ্যে মানুষের মাথা জাগিয়া উঠিল। দু'জনে বিস্মিত ক্রোধের সঙ্গে দেখিলেন দাঁতপড়া।

প্রথম বাবু শুধাইলেন—কি বলছিলেন?

—বলবো আর কি! আপনাদের কথা শুনে মনে হলো বুঝি পাওনাদার এসেছে। জানেন তো একখানা বাড়ি করেছি। চুন আর সুরকিওয়ালারা তাগিদ করছে—হঠাৎ মনে হলো তাদেরই কেউ বুঝি এসেছে!

দ্বিতীয় বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কত খাতা গুণলেন?

—কত আর? মোট দেড় হাজার!

দেড় হাজার শুনিয়া প্রথম বাবু এত বড় হাঁ করিয়াছিলেন যে চোয়ালের হাড় আর স্বস্থানে নামিতে চায় না।

দ্বিতীয় বাব শুধাইলেন—মুখ যে শুকিয়ে গিয়েছে, এসেছেন কখন্?

—সেই সকাল সাড়ে চারটায়।

—খেলেন কি?

—খাবো আর কি? চারটে চিঁড়ে আর কিছু গুড় চাদরে বেঁধে এনেছিলাম—তাই।

প্রথম বাবুর চোয়াল এতক্ষণে যথাস্থানে নামিয়াছে। তিনি শুধাইলেন—অত সকালে ওঠেন কি করে?

—কি আর বলবো! কর্পোরেশনের স্ক্যাভেঞ্জারদের একজনকে বলে রেখেছি, বাড়ির পাশ দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাবার সময়ে ডেকে দেয়!

দাঁতপড়ার দুটি ভূতপূর্ব দাঁতের অবকাশ দিয়া কথার অনেকটা অংশ বায়ুরূপে বাহির হইয়া যায়, সব বোঝা যায় না ; তবে যেটুকু বোঝা যায় তাহাতে মনে হয় তিনি একজন ‘সুপারম্যান’।

দাঁতপড়া বলিল—আরে শুনেছেন সুখবর ! টেকো আর আসবে না !

দুইজনে কোরাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—কেন ? কেন ?

—কাল রাতে পড়ে গিয়ে তার দুই পা ভেঙে গিয়েছে, মাথায় চোট লেগে ব্রেন ছিট্‌কে বেরিয়ে পড়েছে।

টেকো আর আসিতে পারিবে না, তাহার দিক হইতে আর অর্থ-ক্ষয়ের আশঙ্কা নাই শুনিয়া, দুইজনে সত্যই তাহার জন্য সমবেদনা বোধ করিলেন।

এমন সময়ে বাহিরে মোটরের শব্দ হইল। বোধ করি নূতন খাতার স্তূপ আসিয়াছে মনে করিয়া সকলে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

তাহারা বাহিরে গিয়া দেখিল অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি হইতে জন চার লোক টেকোকে সযত্নে টানিয়া বাহির করিতেছে। একজন নার্স তাহার মাথায় বরফের থলি ধরিয়া আছে আর একজন ডাক্তার তাহার নাড়ি ধরিয়া দণ্ডায়মান।

দাঁতপড়ার দল জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপার কি ?

টেকো আর্তস্বরে বলিল —কাগজ গুণতে এলাম।

—কি সর্বনাশ !

—আপনি যে আহত !

টেকো বলিল—সেই জন্যই তো অ্যাম্বুলেন্সে আসতে হলো।

দাঁতপড়া বলিল—শুনেছি আপনার ব্রেন ছিট্‌কে বেরিয়ে পড়ে গিয়েছে।

টেকো বলিল—আরে খাতা গুণতে কি ব্রেন লাগে!

ডাক্তার বলিল—ব্রেন দিয়ে মাথার খুলির খানিকটা জায়গা মিছামিছি ভর্তি করে রাখা হয়েছে।

. টেকো বলিল—তবে ব্রেন একেবারে নষ্ট হয়নি। এই দেখুন না ওই থার্মোফ্লাস্কে করে ভরে নিয়ে এসেছি। দরকার হলে ব্যবহার করবো।

তারপর সে ডাক্তারের দিকে ফিরিয়া বলিল—ডাক্তারবাবু, ব্রেন বেরিয়ে যাবার পর থেকে মাথা বেশ হাল্‌কা বলে মনে হচ্ছে।

তখন সকলে মিলিয়া টেকোকে ঘরে ঢুকাইল। টেকো মেঝের উপরে শুইয়া পড়িয়া কড়িকাষ্ঠের দিকে তাকাইয়া খাতা গুণিতে লাগিল ৩ আর ৫ আট আর ২॥ সাড়ে দশ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় বাবু প্রথম বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি যে চুপ?

প্রথম বাবু তবু নিরুত্তর।

তখন তাকাইয়া দেখে প্রথম বাবুর বিস্ময়ের হাঁ এত বড় হইয়াছে যে আবার চোয়াল আটকাইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় বাবু বলিলেন—ডাক্তারবাবু, এদিকে যে বিপদ।

ডাক্তার বলিল—আমার রোগী এখন-তখন, অন্যদিকে মন দেবার সময় আমার নেই। আপনারা বরঞ্চ কোন ছুতোরের কাছে যান—হাতুড়ি ঠুকে ঠিক করে দেবে।

তখন অগত্যা দুইজনে প্রথম বাবুর অবাধ্য চোয়ালের একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহাকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

এদিকে মুমূর্ষু টেকো ২ আর ৩ পাঁচ আর ৭॥ সাড়ে বার করিয়া খাতা গুণিয়া চলিল!

সঙ্গীরা ভাবিতে লাগিল—ধন্য কর্তব্যজ্ঞান!

অর্থ-পুস্তক

কিছুদিন হইল অজীর্ণ ও দারিদ্র্যে ভুগিতেছি।

বন্ধুরা বলিল—ঔষধ খাও।

চিকিৎসকের কাছে গিয়া ঔষধ লইলাম, মূল্য দিলাম। ঔষধ খাইলাম, বলা বাহুল্য অজীর্ণ সারিল না এবং দারিদ্র্য বাড়িল।

পাঠক, তুমি বলিবে যে ভুল ঔষধ খাইয়াছি! কিন্তু না, ঔষধ ঠিকই হইয়াছিল—নচেৎ অজীর্ণ বাড়িবে কেন?

অজীর্ণ ও দারিদ্র্যের গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে পড়িয়া যে অবশ্যম্ভাবীর মুখে ভাসিয়া চলিয়াছি সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুমাইয়া এক স্বপ্ন দেখিলাম—স্বপ্নে এক দেবীর আবির্ভাব হইল।

আমি শুধাইলাম—মাতঃ, তুমি কে?

দেবী বলিলেন—বৎস, আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? ভালো করিয়া দেখ।

ভালো করিয়া দেখিয়া চিনিলাম—ইনি দেবী সরস্বতী। পঞ্জিকার পাতায় বীণাবাদিনীর যে মূর্তি দেখা যায়—একেবারে ঠিক সেই মূর্তি। মায় সেই ধবধবে সাদা হাঁসটি পর্যন্ত।

আমি বলিলাম—মাতঃ, অপরাধ লইও না—প্রথমটা ঠিক ঠাহর করিতে পারি নাই।

তিনি বলিলেন—তোমার আর দোষ কি? ইস্কুলে কলেজে তো আমার চর্চা কর নাই। না চিনিবারই কথা।

আমি বলিলাম—কলেজের দোষ দিও না, ততদূর পৌঁছাইতে পারি নাই।

তার পরে একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম—তা আপাতত আমার কাছে কেন জানিতে পারি কি ?

তিনি বলিলেন—বৎস, তোমার দুঃখে মন বড় বিচলিত হইয়াছে—তাই আসিয়াছি।

আমি পুনরায় শুধাইলাম— মাতঃ, দীনের নির্বুদ্ধিতা ক্ষমা কর—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আমি তো কখনো তোমার সাধনা করি নাই—তবে এমন অযাচিত কৃপা কেন ?

দেবী বলিলেন—বৎস, তুমি আমার সাধনা কর নাই বলিয়াই তোমাকে আমি স্নেহ করি। আমার বড় বড় সাধকগণ যে পরিমাণে কালি আমার গায়ে নিক্ষেপ করে এ রকম আর কিছু দিন চলিলেই 'সব কাল হো যায়গা'।

এমন সময় দেবীর হাঁসটা শব্দ করিয়া উঠিল।

অমনি দেবী বলিলেন—এই দেখ, আমার বাহনটির দশা দেখ। আমার সাধকগণ উহার পালক ছিঁড়িয়া লইতে লইতে উহাকে দেউলে করিয়া তুলিয়াছে। তুমি যে এ-সব কর নাই তাহাতে তোমার প্রতি আমার অনুকম্পা হইয়াছে—তোমার দুঃখের সমাধান করিয়া দিতে আসিয়াছি।

আমি পুলকিত হইলাম।

দেবী বলিলেন—শোন চিকিৎসকেরা বলিয়াছে—তোমার আসল ব্যাধি অজীর্ণ। তাঁহারা অজীর্ণের চিকিৎসা করিতেছেন। কিন্তু আমি বলিতেছি, তোমার মূল ব্যাধি দারিদ্র্য, দারিদ্র্যের ঔষধ পড়িলেই অজীর্ণ সারিবে।

আমি বলিলাম—দেবতারা যে অন্তর্যামী এতদিনে তাহা বিশ্বাস হইতেছে—নহিলে এমন রহস্য কে আর উদ্ঘাটন করিতে পারিত ?

তখন তিনি বলিলেন—বৎস, এবার যাহা বলিতেছি—মন দিয়া শোন। দারিদ্র্য-ব্যাধি হইতে যদি মুক্ত হইতে চাও, তবে পুস্তক লিখিতে আরম্ভ কর।

—পুস্তক ! ! !

দেবতারা শুধু অন্তর্যামী নহেন, পরিহাসরসিকও বটেন !

অন্তর্যামী আমার মনের কথা বুঝিলেন। বলিলেন—বৎস, অর্থ-পুস্তক লেখ—দারিদ্র্য দূর হইবে।

এই পর্যন্ত বলিয়া দেবী মিলাইলেন—স্বপ্নভঙ্গ হইল।

* * * *

পরদিন সকালে উঠিয়া ভাবিতে লাগিলাম—ব্যাপার কি ? ভাবিলাম একবার স্বপ্নতত্ত্বটি ডাক্তার গিরিনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিব।

বিকালবেলা ডাক্তারের বাড়ির দিকে যাইবার সময়ে পার্শি-বাগানের মোড়ে একখণ্ড কাগজ উড়িয়া আসিয়া আমার হাতে পড়িল !

এ কি কাকতালীয় যোগ ! না—কার্যকারণ যোগ ! এ যে অর্থ-পুস্তকের একখানি পাতা।

ডাক্তারের বাড়ি আর যাওয়া হইল না ! তখনই বাড়ি ফিরিলাম এবং তৎক্ষণাৎ সেই পাতাটিকে আদর্শ করিয়া অর্থ-পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

তারপরে দিন নাই, রাত্রি নাই, সকাল নাই, বিকাল নাই, শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই—কেবল অর্থ-পুস্তক লিখিয়া চলিয়াছি অর্থাৎ স্কুলের বইয়ের অর্থ লিখিয়া চলিয়াছি।

পাঠক, তোমাকে কিঞ্চিৎ নমুনা না দিয়া পারিতেছি না—এই স্বপ্নাদ্য ঔষধ তোমার কাজে লাগিলেও লাগিতে পারে। মনে রাখিতে চেষ্টা করিও—

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।" এই দুরূহ ও

বহুতথ্যপূর্ণ ছত্রটিকে অর্থ-পুস্তকের সুদর্শন চক্রযোগে কেমন ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছি দেখ।

বৃষ্টি—মেঘ হইতে পতিত জলধারা বিশেষ

পড়ে—পতিত হয়

টাপুর টুপুর—পাতার উপরে জল-পতন শব্দ

নদেয়—নদীতে ; নদীয়াতেও হইতে পারে

এল—আগত হইল

বান—বন্যা ; বর্ষার কূলব্যাপী জলরাশি।

পাঠক, দেখিলে তো! কিন্তু এখনও সব দেখ নাই—আরও বিস্ময় জমা আছে। এইবার 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' দেখ :

"ইহা বর্ষার কবিতাও হইতে পারে। আবার ভক্তিধর্মের প্লাবনে নদীয়ার অবস্থার বর্ণনাও হইতে পারে। সে-ক্ষেত্রে 'বৃষ্টি' অর্থ 'চোখের জল' ; চোঁখের জল পড়িয়া পড়িয়া নদীয়ায় বন্যা উপস্থিত হইল।"

পাঠক, এই অর্থ লিখিত না হইলে কি বাঙালীর ছেলে কবিতাটি বুঝিতে পারিত। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি—আমার অর্থ-পুস্তক পড়িবার আগে বাঙালীর ছেলে 'বৃষ্টি' কি জানিত না—'টাপুর টুপুর' কি জানিত না। আর ওই বহুপ্রচলিত ছত্রটিতে যে এত ভক্তি-তত্ত্ব লুকানো ছিল তাহাই বা কে জানিত! ধন্য আমি! ধন্য আমার লেখনী! এক একবার নিজেই নিজের পিঠ চাপড়াইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু নেহাৎ শরীরসংস্থান বাম।

এখন আমার দরজায় প্রকাশকদের মোটরগাড়ি সর্বদা দণ্ডায়মান। তিনটি মুদ্রাযন্ত্র আমার অর্থ-পুস্তক ছাপিয়া সময় পায় না। হাজার হাজার ক্যান্‌ভাসার আমার বই বাংলার পল্লীতে পল্লীতে বিক্রয় করিয়া ফিরিতেছে।

আমার দারিদ্র্যব্যাধি সারিয়াছে, কাজেই অজীর্ণও আর নাই। কিন্তু তোমাদের বিজ্ঞান বলে, শক্তির ক্ষয় নাই—রূপান্তর আছে। সুতরাং আমার অজীর্ণ ও দারিদ্র্য বাংলার সুকোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের ঘাড়ে গিয়া চাপিয়াছে। আমি অর্থ-পুস্তকের প্রকৃত অর্থ এতদিনে আয়ত্ত করিয়াছি।

অনেকদিন পরে পথে হঠাৎ রামতনুর সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞাসা করিলাম —এ কি রামতনু, এতদিন দেখি নি, কোথায় ছিলে?

সে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া উত্তর দিল—আজ্ঞে না, একটু কাজ ছিল।

কাজ! তবে বোধ হয় বিবাহ করিতে গিয়াছিল!

বলিলাম—কি বিবাহ নাকি?

সে বলিল—আজ্ঞে, না, একটা ডিগ্রির চেষ্টায়!

অবাক হইলাম—রামতনু আবার কি ডিগ্রি লাভ করিবে!

আটবার চেষ্টা করিয়া এম. এ. পাস করিয়াছে সে।

—ডিগ্রি? কি ডিগ্রি বাপু?

সে বলিল—আজ্ঞে, পি-এইচ্. ডি.।

অজ্ঞাতসারে আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল—পি-এইচ্. ডি, হোমিও?

লজ্জিত রামতনু বলিল—আজ্ঞে না, ডক্টর অব্ ফিলজফি।

—দিল কে?

—বিশ্ববিদ্যালয়।

একেবারে বসিয়া পড়িলাম। মাটিতেই বসিতাম, কিন্তু পাশে একখানা বেঞ্চি ছিল, টলিতে টলিতে গিয়া তার উপরে বসিলাম। রামতনু বোধ হয় মনে করিল আমি তাহার বিদ্যার ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া বসিতে বাধ্য হইলাম। বিদ্যার ধাক্কা কিনা জানি না, বিস্ময়ের ধাক্কা যে লাগিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মনে পড়িল রামতনুর মতো নিরেট মূর্খ আমি দুটি দেখি নাই। ম্যাট্রিকুলেশন হইতে এম. এ. পাস করিতে যে ছয় বছর লাগে রামতনু তাহাকে বিশ বছরে পরিণত করিয়াছে। ইস্কুলে সে কয় বছর অধ্যয়ন করিয়াছে সে ইতিহাস আমার অজ্ঞাত। এখন বয়স তাহার চল্লিশের উপরে। সেই রামতনুর পি-এইচ্. ডি. ডিগ্রিলাভ! নাঃ জগতে বিস্ময়ের অন্ত নাই দেখিতেছি।

রামতনুকে পাশে বসাইয়া তাহার ডিগ্রিলাভের ইতিহাস জানিয়া লইলাম।

রামতনু এ রহস্য প্রকাশ না কবিতে অনুবোধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার কথা রাখিতে পারিলাম না—সাধারণের, বিশেষ ডিগ্রি-লাভার্থীদের হিতার্থে প্রকাশ করিলাম—আশা করি ইহাতে বাঙালী উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছাত্রদের প্রভূত উপকার হইবে।

আমি [রামতনু] এম. এ. পাস করিয়া দেখিলাম যে একটা পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি না পাইলে জীবনই বৃথা ; চাকরি তো দূরের কথা, কেহ বসিতেও বলে না। কিন্তু ডক্‌টরেট্ লাভ করা সহজ নয়। অবশেষে গুরুর অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম, কিন্তু আমাকে কেহ শিষ্য করিতে রাজী হয় না। কেহ বিদ্যার অভাব বলে, কেহ বুদ্ধির অভাব বলে, কেহ টাকার অভাব বলে! একজন পরামর্শ দিল ডক্‌টরেটের পরিবর্তে মাথার চুল পাকাও, লোকে বিজ্ঞ মনে করিবে। আর একজন বলিল—আমেরিকা হইতে টাকা দিয়া একটা ডিগ্রি আনাইয়া লও। শ্যামবাজারের খুড়ো বলিল—আরে ছাই, গবেষণা শুরু করিয়া দাও। মাথা-মুণ্ডু যাহা মনে আসে লিখিয়া যাও। পুরু কাগজে ছাপিয়া ভালো করিয়া বাঁধাও, সোনার জলে নাম লিখিয়া দাও ; এমন কিছুদিন করিতে থাকো, অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় তোমার বিদ্যার নর্দমা বন্ধ করিবার জন্য স্বেচ্ছায় ডক্‌টরেট্ দিয়া তোমাকে থামাইতে বাধ্য হইবে।

কিন্তু লিখিব কি? অবশ্যই ভুল লিখিব—কিন্তু ভুল লিখিতে হইলেও কিছু লিখিতে হইবে—তাই বা পাই কোথায়?

প্রায় যখন হতাশ হইয়া পড়িয়াছি, তখন হঠাৎ একদিন কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে তাঁহার সঙ্গে দেখা। একেবারে চারি চক্ষের মিলন। গুরু-শিষ্য পরস্পরকে দেখিয়াই চিনিয়া ফেলিল।

তিনি বলিলেন—ডক্‌টরেট্ চাও?

তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন।

তারপরে আরম্ভ করিলেন—বৎস, আরামতনু (এই উপসর্গটি আমার গুরুর দান) শোন, জ্ঞান বলিয়া কিছু নাই; জ্ঞান সৃষ্টি করিতে হয়। যেমন ইট দিয়া নানা রকমের ইমারত তৈয়ারি করা যায়, তেমনি বর্ণমালার সমাবেশে জ্ঞান-জগতের সৃষ্টি। আশা করি তুমি বর্ণমালা জানো, কাজেই জ্ঞানও তোমার আয়ত্ত। এখন কেবল উপযুক্ত গুরুর অভাব।

আমি জানাইলাম যে তাঁহাকে পাইয়া তো সে অভাবও পূর্ণ হইয়াছে। তিনি বলিলেন—তোমার যে শুধু গুরুর অভাব পূরণ হইয়াছে তাহা নয়, আমারও উপযুক্ত শিষ্যের অভাব মিটিয়াছে।

তারপর তিনি সেই ধূমাচ্ছন্ন নিভৃত কক্ষে বসিয়া আমাকে 'সরল থীসিস্ রচনা-প্রণালী' শিক্ষা দিলেন! নীহারিকা হইতে যেমন নক্ষত্রের সৃষ্টি, সেই ধূম হইতে আমার জ্ঞানের ধ্রুবনক্ষত্র ধীরে ধীরে বিকশিত হইতে লাগিল।

তিনি বলিলেন—থীসিস্ রচনা-প্রণালীর কয়েকটি মূলসূত্র আছে। প্রথম, থীসিস্‌কে যতদূর সম্ভব নীরস করিবে। ইহাতে কত সুবিধা দেখ;—সাধারণ পাঠক ইহা পড়িবে না, আর যত কম লোক পড়িবে তত তোমার ফাঁকি ধরা পড়িবার আশঙ্কা কম। তারপরে দেখ—পরীক্ষকগণও তোমার নীরস মরুভূমি তাড়াতাড়ি পার হইবার জন্য দ্রুত

পাতা উল্টাইয়া যাইবেন, কাজেই সাপ, ব্যাঙ কি আছে লক্ষ্য করিবার সময় পাইবেন না। আবার দেখ, থীসিস্ যত বেশি শুষ্ক হইবে তত তোমার সম্বন্ধে পরীক্ষকের ধারণা উচ্চ হইবে, কারণ জ্ঞান জিনিসটা সহজ নয়! সাত্ত্বিকজ্ঞান শুষ্ক হরীতকীর মতো—কঠিন, শুষ্ক, নীরস, কটু; শাঁস আছে কি নাই, থাকিবার মধ্যে আছে প্রকাণ্ড একটা বিচি!

দ্বিতীয়—থীসিস্‌কে যত পারো দীর্ঘ করিবে। বাল্যকাল হইতে লোকে শুনিতে আরম্ভ করে যে জ্ঞানসমুদ্র অপার, এমন কি স্বয়ং নিউটনও নাকি তীরে বসিয়া উপলখণ্ড সংগ্রহ ছাড়া আর বেশি কিছু করিতে পারেন নাই। নিরেট পাঁচ শ' পাতার টাইপ-করা ফুলস্কেপ কাগজের একটা পিরামিড দেখিলে এমন কোন্ দুঃসাহসী পরীক্ষক আছে যাহার হৃৎকম্প না উপস্থিত হইবে!

তৃতীয়—মনে রাখিবে শাস্ত্রের চেয়ে ভাষ্য সর্বদা বড় হয়। অতএব একছত্র লিখিয়া অন্তত ত্রিশছত্র তাহার ফুটনোট দিবে। ছোট, বড়, মাঝারি, নানা রকম টাইপ দিয়া, নানা ভাষায় ফুটনোট থাকে থাকে নামিয়া গেলে আপনিই পরীক্ষকের চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিবে। আর যদি কোন অরসিক সত্যই পড়িবার চেষ্টা করে, তবে বেশি দূর পড়িতে পারিবে না, কারণ ওই ক্ষুদে বর্জাইস টাইপ পড়িতে পড়িতে সে নিশ্চয়ই অন্ধ হইয়া যাইবে।

চতুর্থ—এমন বিষয় নির্বাচন করিবে, যাহাতে সাধারণের কোন আগ্রহ নাই। যে বিষয় কেহ জানে না, আর জানিতেও চাহে না, সেই বিষয়ে থীসিস্ যেমন চমৎকার হয়, এমন আর কিছুতে নয়। খবরদার, জীবনের সঙ্গে থীসিসের যোগ করিতে কখনো চেষ্টা করিও না।

বিশেষ করিয়া দৃষ্টি রাখিও, তোমার থীসিসে যেন সহজ সত্য না থাকে; জীবনের ছায়া না থাকে; জ্ঞানের তৃষ্ণার পানীয় না থাকে। মৌলিক দৃষ্টিকে সর্বদা এড়াইয়া চলিবে। কখনো সুবোধ্য ভাষা

ব্যবহার করিবে না, এবং কিছুতেই যেন থীসিসটি সুখপাঠ্য ও সরল না হয়। থীসিসের ভাষা প্রতি ছত্রে ছত্রে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিতে থাকিবে, প্রথম কয়েক ছত্রের আঘাতেই পরীক্ষকের দুপাটি দন্ত নির্দন্ত হইবে, তারপরে অনায়াসে সবটা তিনি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিবেন।

এইরূপে প্রাথমিক ভূমিকা শেষ করিয়া তিনি বলিলেন—বৎস, এবার নিম্নের কয়েকটি ছত্রকে তুমি থীসিসে পরিণত কর :—

"একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। বাঘ অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই হাড় বাহির করিতে পারিল না ; অবশেষে সে এক বকের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।"

ব্যস্ ; এইবার পাণ্ডিত্য, অভিধান, ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও উপযুক্ত পরিমাণে অজ্ঞতা মিশাইয়া এই কয়েক ছত্রকে থীসিসে পরিণত করিয়া ফেল।

বাঘ ও বক শব্দের উপরে জোর দিবে। কত রকম বাঘ ও বক আছে তাহার সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত কর। তারপর পৃথিবীর সাহিত্যে কোথায় কোথায় বাঘের ও বকের উল্লেখ আছে সংগ্রহ কর। তারপরে বাঘ ও বকের উল্লেখ একত্র কোথায় আছে সংগ্রহ কর—দেখিবে ইহাতেই প্রায় দেড়শত পাতা ভরিয়া যাইবে।

তার পরে দেখ—এই গল্পটির মূলে ঈসপের লেখাতে বাঘ ছিল 'উল্‌ফ' ; বাংলাদেশে আসিয়া তাহা হইয়াছে 'বাঘ' ; এখন এই সূত্রকে অনুসরণ করিয়া আরও পঞ্চাশ পাতা লিখিবে। এখানে গ্রীসের ও বাংলাদেশের ভূগোল লইয়া একটা গোলমাল পাকাইয়া তুলিবে। বলিবে যে বাংলাদেশের রয়াল বেঙ্গল টাইগারের প্রভাবে গ্রীক 'উল্‌ফ' 'বাঘ' হইয়া উঠিয়াছে। প্রসঙ্গত সুন্দরবন, পর্তুগীজ দস্যু ও পর্তুগাল সম্বন্ধে কয়েক পাতা লিখিবে। তারপরে বাঘ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ফুটনোটে লিখিবে—'হাজারিবাগ' নামের ব্যুৎপত্তি কি?

নিশ্চয় কোন সময়ে এখানে এক হাজার ব্যাঘ্র ছিল। তাহার প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করিবে এখনো দুই-চারটি বাঘ দেখা যায়।

এই ফুটনোটের ফুটনোটে বলিবে 'বাগবাজার'-এর মৌলিক নাম 'ব্যাঘ্রবজ্র', ইহার সঙ্গে মহাযান সম্প্রদায়ের 'বজ্র' শব্দের যোগ আছে৭ এখানে পুরাকালে একটি বৌদ্ধমঠ ছিল ; বর্গীদের অত্যাচারে তাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তুমি একখানি প্রাচীন তাম্রলিপি হইতে এসব কথা জানিতে পারিয়াছ ; তাম্রলিপিখানি এতদিন তোমার কাছেই ছিল, সম্প্রতি খোয়া গিয়াছে। তারপরে 'বক' সম্বন্ধে লিখিবে ; মহাভারতের ধর্মরূপী বকের কথা হইতে আরম্ভ করিয়া যেখানে যত বক পাইয়াছ উল্লেখ করিবে।

তারপরে এই গল্পের রাজনৈতিক ভাষ্য করিবে—ইউরোপ হইতেছে বাঘ, এশিয়া বক। ইউরোপ নিজের বিপদ উদ্ধার করিয়া দিবার জন্য এশিয়ার কাছে আসিয়া অনুরোধ করিতেছে। এইখানে সাম্রাজ্যবাদ, বাণিজ্যবাদ, কম্যুনিজম্, জাতীয়তা প্রভৃতি বিষয় লইয়া একটা গোলক-ধাঁধার সৃষ্টি করিবে।

এইরূপে উপদেশ দিয়া গুরু বলিলেন—যাও বৎস, এখন বাড়ি গিয়া থীসিস্ লিখিতে আরম্ভ কর। আমার কথা মনে রাখিলে নিশ্চয় কৃতকার্য হইবে।

গুরুর বাক্য স্মরণ করিয়া আমি ছয় মাস পুস্তকাগার হইতে পুস্তকাগারে ঘুরিয়া সাড়ে সাতশ' পাতার এক জগদ্দল থীসিস্ লিখিয়া ফেলিলাম—এবং অবশেষে একটি শুভদিন দেখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করিয়া দিলাম।

চারমাস পরে একদিন চিঠি পাইলাম যে আমার থীসিস্ মনোনীত হওয়ায় আমি ডিগ্রিলাভ করিয়াছি।

রামতনু বলিল যে তিনজন পরীক্ষকই একবাক্যে আমাকে প্রশংসা

করিয়াছেন। ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার লিখিয়াছেন—"এরূপ অত্যাশ্চর্য থীসিস্ যে লিখিত হইতে পারে তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না। বাঙালী ছাত্রটির মাথার মধ্যে কি আছে দেখিতে কৌতূহল হয়।"

পাঞ্জাবের প্রফেসার বলিয়াছেন—" 'What Bengal thinks today, the rest of India will think tomorrow.' আশা করিতেছি কিছুদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ছাত্রেরা কি করিয়া থীসিস লিখিতে হয় তাহা বাঙালীর কাছ হইতে শিখিবে।"

কলিকাতার প্রফেসার লিখিয়াছেন—"অহো কি প্রগাঢ় জ্ঞান—কি সারগর্ভ চিন্তা! অহো কি হৃদয়গ্রাহী ভাষা! অহো ইতিহাসের অন্ধকার গুহার মধ্যে কি সাহসের সহিত প্রবেশ! এই একখানিমাত্র গ্রন্থ রাখিয়া বাংলা সাহিত্যের আব সব পুড়াইয়া ফেলা চলে। এতদিন পরে বাঙালীর দুর্নাম ঘুচিবে—স্কলার বলিয়া খ্যাতি বাড়িবে। আশা করি বিশ্ববিদ্যালয় এই পণ্ডিত-প্রবরকে একখানি চেয়ার দিয়া নিজেকে ধন্য করিবেন।"

এই পর্যন্ত বলিয়া রামতনু থামিল। আমি কাঁদিব কি হাসিব স্থির করিতে না পারিয়া বিড়ি টানিতে লাগিলাম।

শেষে বাড়ি ফিরিয়া স্থির করিলাম বাঙালী জাতির, বিশেষ বাঙালী ছাত্রদের হিতার্থে ইহা প্রকাশ করা উচিত। তাই ঠিক যেমনটি শুনিয়াছিলাম তেমনি লিখিয়া কাগজে দিলাম। কেবল রামতনুর গুরুর নাম চাপিয়া গেলাম, কারণ তিনি সম্প্রতি দেহরক্ষা করিয়াছেন। রামতনুর নামটাও ছদ্মনাম। আর এই প্রবন্ধের লেখকের নামটাও আমার নাম নয়; আমার সত্য নাম গোপন করিয়া এই বেওয়ারিশ নামটা ব্যবহার করিলাম।

পশু-শিক্ষালয়

দেশপ্রিয় পার্কের যে-অংশটা নৈমিষারণ্য নামে পরিচিত সেখানে অপরাহ্নে একদল পেন্সন ও যষ্টিধারী বৃদ্ধ বসিয়া ধর্মালোচনা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের সমাগমের ফলেই স্থানটি নৈমিষারণ্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছে।

একদিন অপরাহ্নে সেখানে হরিবাবু (যষ্টি ও পেন্সনধারী একজন বৃদ্ধ) কিঞ্চিৎ বিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অপর সকলে একযোগে বলিয়া উঠিল—আজ আপনার বিলম্ব কেন হরিবাবু ?

কথিত হরিবাবু ধীরে-সুস্থে আসন গ্রহণ করিতে করিতে বলিলেন —আর বলবেন না, যেমন হয়েছে দেশের সরকার।

সরকারের অবিমৃশ্যকারিতা সম্বন্ধে সকলেই একমত, সরকারের নানা প্রকার অপরাধের মধ্যে প্রধানতম হইতেছে যে পেন্সনের সঙ্গে D. A. নামে মধুর স্পৃহনীয় উপসর্গটা নাই। কাজেই একজন বলিলেন—আবার নতুন কি হলো ?

—নতুন কোথায়, নিত্য আর পুরাতন।

হরিবাবুর নিত্য আর পুরাতন অভিজ্ঞতা শুনিবার জন্য সকলে আগ্রহ প্রকাশ করিল।

হরিবাবু আরম্ভ করিলেন—নাতিটিকে স্কুলে ভর্তি করবার জন্য আজ মাসখানেক চেষ্টা করছি। যেখানেই যাই, শুনি জায়গা নেই। আরে মোলো যা, পড়বে তার আবার জায়গার কি প্রয়োজন? এ কি খাওয়া না শোয়া ? সকলেই জানায়, অতিরিক্ত নিলে সরকার থেকে গ্র্যাণ্ট বন্ধ করে দেবে। শুনুন একবার কথা। গ্র্যাণ্ট বন্ধ করবে! কেন

গ্র্যাণ্ট কি সরকার ঘর থেকে দেয়! যাই হোক, এইভাবে স্কুল থেকে স্কুলে মাস খানেক ঘুরে ভর্তি করবার আশা যখন ছেড়ে দিয়েছি তখন পেলাম একটা স্কুলের সন্ধান।

অবশ্য সেখানেও নানা রকম আপত্তি উঠিয়াছিল, কিন্তু হাতে-পায়ে ধরে দিলাম শেষ পর্যন্ত ভর্তি করে।

—যাক, তা হলে আপাততঃ আপদ শান্তি। অপরে বলিলেন, নামটা শুনে রাখি, কাজে লাগতে পারে।

হরিবাবু বলিলেন—স্কুলটার নাম নিখিলবঙ্গ পশু বিদ্যালয়।

একজন বলিলেন—তার মানে ভেটারিনারি স্কুল?

অপরে বলিলেন—বেশ করেছেন—ওর prospect আছে। পশু-চিকিৎসা জানা এ দেশে খুব দরকার।

হরিবাবু বলিলেন—ভেটারিনারি স্কুল নয়, সেখানে তো হয় পশুর চিকিৎসা। এখানে খোদ পশুরা শিক্ষা পায়।

—বলেন কি মশায়?

—যা দেখলাম তাই বলি। বাঘ ভালুক শেয়াল কুকুর বেড়াল বানর গাধার বাচ্চারা পাশাপাশি বেঞ্চিতে বসে লেখাপড়া শিখছে।

বিস্মিত হইয়া সকলে শুধায়—আর হেডমাস্টার, শিক্ষক, পণ্ডিত প্রভৃতি?

—তারাও পশু, তবে বয়স বেশি, হেডমাস্টার একটা বুড়ো ষাঁড়।

—বলেন কি মশায়, এমন স্কুলের নাম তো জানতাম না।

—একটিই আছে কি না। তা ছাড়া, ওরা আত্মপ্রচার পছন্দ করে না।

—তা মানুষের ছেলেকে নিতে চাইলো?

—সেই তো বিপদ! বলে, মানুষের ছেলের সাহচর্যে পশুর বাচ্চারা খারাপ হয়ে যাবে। যাই হোক, আমি নাছোড়বান্দা হয়ে হাতে-

পায়ে ধরে, আমার নাতিটাই পশু হয়ে উঠবে, পশুরা মানুষ হবে না, এমনি কত সব স্তোকবাক্য বলে দিলাম শেষ পর্যন্ত গছিয়ে। হেডমাস্টার বললেন, আচ্ছা নিলাম ছোকরাকে স্পেশাল কেস হিসাবে —আর অনুরোধ করবেন না।

হরিবাবুর অভিজ্ঞতা শুনিয়া সকলের বিস্ময়ের অভিজ্ঞতা রহিল না, এবং সকলেই মনে মনে ভাবিতে লাগিল—হরিবাবু খুব জিতে গেল। আমাদের ছেলেপিলে নাতিরা মানুষ ছাড়া তো আর কিছু হবে না, হরিবাবুর নাতি আস্ত একটা পশু হবে। আঃ, কি সৌভাগ্য হরিবাবুব।

তারপরে সকলে মনের ঈর্ষ্যা গোপন করিয়া এবং হরিবাবুর সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়া উঠিয়া পড়িলে সেদিনের মতো নৈমিষারণ্যের অধিবেশন সমাপ্ত হইল।

২

মাসখানেক পরে হরিবাবু আবার একদিন সময় অতিক্রম কবিযা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নৈমিষারণ্যের সহধর্মিগণ বলিয়া উঠিল—আবার আজ হঠাৎ দেরী কেন?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হরিবাবু বলিলেন—আর বলবেন না, কপাল!

—কি হলো মশায়?

—নাতিটাকে স্কুল থেকে আনিয়ে নিতে বাধ্য হলাম।

—কেন? পশুর সঙ্গে থেকে কদভ্যাস শিখছিল বুঝি?

—না, পশুরাই ওর সাহচর্যে কদভ্যাস শিখছিল এই অভিযোগ!

—কি আশ্চর্য!

—আশ্চর্য বোধ করবেন না—সমস্তটা শুনুন।

হরিবাবু বলিতে লাগিলেন—হেডমাস্টারের জরুরি চিঠি পেয়ে গিয়ে হাজির হলাম। ব্যাপার কি ?

তিনি বললেন, আপনার নাতিটিকে নিয়ে যান মশায় !

কেন, তার অপরাধ কি ?

অপরাধ তার ব্যক্তিগত না হতে পারে, ওটা মানুষের জাতিগত স্বভাব।

খুলেই বলুন।

হেডমাস্টার বলতে লাগলেন, পশুরা কদভ্যাস শিখছে ওর কাছ থেকে।

বলেন কি ? পুঁটে আমার ভালো ছেলে, রোজ দু'বেলা গীতা পড়ে।

তা পড়ুক—সবটা শুনুন।

হেডমাস্টার বলে চলেন—পশুরা সবাই সবাইকে আপন মনে করে, এ পর ও আপন এ জ্ঞান আমাদের নেই। আপনার পুঁটে এ জ্ঞানটি ইতিমধ্যে বাঁচ্চাদের দিয়েছে।

কেমন ?

দুটো কুকুরের বাচ্চা পরস্পরকে ভাই বলে জানে। ও বলল, তোরা আপন ভাই, না বৈমাত্র, না খুড়তুতো-জেঠাতো, না কেবল গ্রাম-সম্পর্কে ভাই ?

ক্ষতি কি ?

মনুষ্য-সমাজে ক্ষতি না হতে পারে—পশু-সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, ওতে সমাজের ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়।

আর কি অভিযোগ ?

পশুদের সকলের অপরের দ্রব্যে সমান অধিকার, এটা আমার, ওটা অপরের, এ বোধ তাদের নেই। আপনার পুঁটের কল্যাণে সবাই এখন জিনিসপত্রে আপন-পর ভেদ করতে শিখেছে।

ক্ষতি কি—মানুষের সমাজে তো এমন চলে।

তাই মানুষের সমাজের আজ এমন অবস্থা।

আর কি অভিযোগ?

কত বলবো। পুঁটে বাচ্চাদের চুরি করতে, মিথ্যা কথা বলতে শেখাচ্ছে। আবার এর মধ্যে একদিন সবাইকে নিয়ে মিছিল বের করে কি সব চাই বলে ঘোষাচ্ছিল! গেল আমাদের পশু-সমাজ। না মশাই, নিয়ে যান আপনার নাতিকে।

খুব রাগ হলো আমার, বললাম, এ ষাঁড়ের মতোই কথা বটে।

শুনে, বলবো কি মশাই, বেটা বুড়ো বলীবর্দ এমন এক বিরাট গর্জন করে উঠলো যে কোথায় লাগে তার কাছে সত্যাগ্রহীদের অহিংস গর্জন!

সবাই শুধায়—কি করলেন তখন?

—যে শিং নাড়া, যে গর্জন, আর কি করবার থাকতে পারে? নাতিটার হাত ধরে পালিয়ে চলে এলাম।

—তা নাতিকে এবারে কোথায় ভর্তি করে দেবেন ভাবছেন?

—না, আর ইস্কুলে নয়।

—তবে?

—এবারে ভাবছি বড়বাজারের এক গদিতে ঢুকিয়ে দেবো।

—ব্যবসা শেখাবেন বুঝি! ভালো, ভালো।

—হ্যাঁ, ব্যবসাই এক রকম।

—এক রকম মানে? ব্যবসার কি আবার রকম-ভেদ আছে নাকি?

—সব ব্যবসার সেরা ব্যবসা শেখাবো ওকে।

—কি সেটা?

—জানেন সবাই, কেবল সাহসের অভাবে স্বীকার করতে পারছেন না।

—তবু শুনি কি সেটা ?

—চোরা-কারবার।

সকলে স্বস্তির সঙ্গে বলিল—এই ! আমরা ভাবছিলাম না জানি সেটা কি ! তা চোরা-কারবারে আবার সাহসের কি প্রয়োজন ? ন্যায্য কারবারেই আজ প্রয়োজন হয় সাহসের।

এই বলিয়া সকলে সরকারের সমালোচনায় আত্মনিয়োগ করিল।

হরিবাবু উঠিয়া পড়িলেন। বড়বাজারের গদি শিক্ষানবিশির মাশুল হিসাবে যে টাকাটা দাবি করিয়াছে তাহা যোগাড় করিতে হইবে।

ধনেপাতা

প্রায় হাজার বছর আগেকার কথা বলিতেছি। কাশ্মীরের অন্তর্গত শ্রীনগর শহরের চকে প্রাতঃকালে প্রাত্যহিক বাজার বসিয়াছে। বড় বড় দোকানগুলি সব রাজপুতদের, মাড়োয়ারীদের, কতক কচ্ছিও আছে; ছোটখাটো দোকানগুলি স্থানীয় লোকদের। চকের চারিদিকে দোকানঘর। মাঝখানে ফাঁক, সেখানে দুই সারিতে তরি-তরকারি, ফল-মূল, শাকসব্জির দোকান। এমন অনেকগুলি সারি; মাঝখানে লোক-চলাচলের পথ। আর পাহাড়ীরা পাহাড় হইতে জ্বালানি কাঠ, চাকের মধু, মোম প্রভৃতি আনিয়াছে, বাজারের খাজনা এড়াইবার উদ্দেশ্যে তাহারা একেবারে চকের প্রান্তে বসিয়াছে—সীমানার ঠিক বাহিরেই।

খুব ভোরে বাজার বসে, ভোর হইতেই খরিদ্দার জমিতে থাকে। লোক আসে, কেনে, চলিয়া যায়; আবার লোক আসে, কেনে, চলিয়া যায়—এমনি ভাবে চলিতে থাকে।

আজকের দিনেও বাজারের যেমন দৃশ্য, যেমন হাঁক-ডাক, যেমন জন-জনতা, হাজার বছর আগেও তেমনি ছিল কল্পনা করিয়া লইলে ভুল হইবে না।

আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সেদিন বাজার প্রায় ভাঙে ভাঙে অবস্থা। এমন সময়ে একজন সব্জিওয়ালা পার্শ্ববর্তীকে সভয়ে বলিয়া উঠিল—ভাই, দেখ দেখ।

পার্শ্ববর্তী সেদিকে তাকাইয়া বলিল—তাই তো, ঠক্কুররা আসছে, এইবার ঝগড়া শুরু হলো!

তখন দোকানীরা তাড়াতাড়ি দোকানের দরজা বন্ধ করিতে শুরু করিল। যাহারা বাহিরে বসিয়াছে, তাহারা অবিক্রীত জিনিসগুলি এদিকে ওদিকে সরাইয়া রাখিতে লাগিল। ভুক্তভোগী দু-এক জন বিক্রয়ের আশা ছাড়িয়া দিয়া পসরা মাথায় তুলিয়া স্থানত্যাগে উদ্যত হইল। সমস্ত বাজারময় 'রাখ্-রাখ্' 'ঢাক্-ঢাক্' ভাব।

একজন বলবান লোক বলিল—আর ভাই, সেদিন এক পোড়ো ঠক্কুর আমার পাঁঠার বাচ্চাটা এমনি নিয়ে যায় আর কি! আমি চাইলাম ছটা পয়সা, দুটো পয়সার বেশি দিল না।

—দু'ঘা দিয়ে দিলে না কেন?

—ইচ্ছে তো করছিল, কিন্তু ওদের যে শরীর, ভয় হলো, মট্ করে ভেঙে যাবে!

—যা বলেছ, এদিকে শরীর তো ঐ, কিন্তু সাজের বাহার দেখে মনে হয় রাজপুত্তুর।

—বলে তো তাই! ওরা সবাই নাকি রাজার ছেলে!

—গৌড়ে এত রাজা?

—তা হলেই বুঝতে পারছ, সে দেশের অবস্থা কেমন? আমরা একটা রাজার ভার সইতে পারি না।

—রাজপুত্তুর, তাতে আর সন্দেহ কি! পড়বার নাম করে এখানে এসে দিন নাই, রাত নাই, পাহাড়ী মেয়েগুলোর সঙ্গে নাগরপনা করা!

—ওদের দেশে কি মেয়ে নেই?

—আরে ভাই, ঐ যে কথায় বলে—'ঘরকা মুরগী ডাল বরাবর।' ওদের মুখে কাশ্মীরী নাশপাতি গৌড়ী আমের চেয়ে অনেক মধুর!

এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছে, ইতিমধ্যে গৌড়ীয় ঠক্কুরগণ সব জিওয়ালাদের কাছে আসিয়া পড়িল।

সংখ্যায় ইহারা আট-দশ জন হইবে।

"এই সকল বিত্থার্থীর মুখে পান, পরনে ধুতি, গায়ে উত্তরীয়; বাবরী চুল স্কন্ধে লম্বিত, হাতে ছত্র, নখ লাল রঙে রঞ্জিত; ইহারা ধীরে ধীরে পথ চলে, থাকিয়া থাকিয়া দর্পিত মাথাটি এদিক-ওদিক দোলায়; হাঁটিবার সময়ে ইহাদের ময়ুরপঙ্খী জুতার মচ্‌মচ্‌ শব্দ হয়, মাঝে মাঝে নিজেদের সুবেশ-সুবিন্যস্ত চেহারাটার দিকে তাকাইয়া দেখে; আর কটিতে ইহাদের লাল কটিবন্ধ।"

কয়েকজন ভিক্ষুক ইহাদের পিছনে লাগিয়া গিয়াছে। কোন ভিক্ষুক বলিতেছে, 'সোনার চাঁদ', কোন ভিক্ষুক বলিতেছে, 'গৌড়ের রাজা', কোন ভিক্ষুক বা 'পঞ্চ গৌড়েশ্বর' বলিতেছে।

অভিধাগুলি বিত্থার্থীদের ভালোই লাগিতেছে মনে হয়। মাঝে মাঝে দু-এক জন মুখ ফিরাইয়া দেখিতেছে, কোনো অভিধা নিজের প্রতি কথিত হইয়াছে মনে করিলে ভিক্ষুককে একটি কড়ি ফেলিয়া দিতেছে।

এক ঠক্কুর অপর জনকে বলিল—নরেন্দ্র, তুমি উহাকে কড়ি দিলে কেন? ও ব্যক্তি 'পঞ্চ গৌড়েশ্বর' আমাকে বলিয়াছে।

নরেন্দ্র বলিল—ধীরেন্দ্র, এ কেমন তোমার আচরণ, ঐ ব্যক্তি আজ দুই বৎসর আমাকে পঞ্চ গৌড়েশ্বর বলিতেছে।

—বুঝিলে কি প্রকারে?

—আমি যে উহাকে চিনি, লোকটা অন্ধ—

—তাই বল, অন্ধ বলিয়াই বলিয়াছে। নতুবা—

তখন দীনেন্দ্র বলিল—তোমরা প্রকাশ্য বাজারে এরূপ ব্যবহার করিও না। মনে রাখিও, একমাত্র গৌড়বাসিগণই 'কৃষ্টিসম্পন্ন'—অন্য কোন দেশের লোকের কৃষ্টি নাই? তাহারা এতদবস্থায় গৌড়বাসীকে দেখিলে কি ভাবিবে?

তখন নরেন্দ্র ও ধীরেন্দ্র একযোগে বলিল—যথার্থ বলিয়াছ। কৃষ্টি রক্ষার্থ আমরা গৌড়বাসীরা সকল প্রকার সংযম করিতেই পারি, এমন কি রসনা-সংযমও অসম্ভব নহে।

দীনেন্দ্র বলিল—তা ছাড়া বাজার করাও আবশ্যক। সেটাও তুচ্ছ নয়।

—নিশ্চয় নয়, কৃষ্টির সঙ্গে যখন কাঁকুড় যুক্ত হয়, তখন তাহার প্রভাব অনস্বীকার্য।

—শুধু কাঁকুড়ই বা কেন? কৃষ্টির সঙ্গে করলা?

—কৃষ্টির সঙ্গে কদলী?

—কৃষ্টির সঙ্গে কাঁকরোল?

—কৃষ্টির সঙ্গে কয়েৎবেল?

—কৃষ্টির সঙ্গে কচু?

দীনেন্দ্র বলিল—তোমরা কি মুখে মুখেই বাজার শেষ করিবে?

সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বাতাসে বেতের লতাসকল যেমন একযোগে দুলিতে থাকে, তেমনি নিজেদের রসিকতার বেগে তাহাদের তনুদেহ তালে তালে এদিক-ওদিক আন্দোলিত হইতে লাগিল।

একজন সব্‌জিওয়ালা মৃদুস্বরে বলিল—দেখো ঠাকুর, ভেঙে না যায়।

আর একজন বলিল—দেহটা গেলে সাধের সাজ-পোশাকগুলোর কি হবে?

একজন ভিক্ষুক বলিয়া উঠিল—'মেন্‌কা বাঈ, মেন্‌কা বাঈ'।

নিজেকে মেন্‌কা বাঈ বলিয়াছে ভাবিয়া প্রত্যেক ঠাকুর ভিক্ষুকের উদ্দেশ্যে একটা করিয়া কড়ি ছুঁড়িয়া দিল। মেন্‌কা বাঈ শ্রীনগরের প্রসিদ্ধ নর্তকী।

এবারে সকলের হুঁশ হইল। নরেন্দ্র বলিল—ভাই, বাজার যে ভেঙে গেল!

—যাবে না? যত সব পাহাড়ী ভূত ভোর না হতেই এসে হাজির হয়! আমরা তো এক প্রহরের আগে শয্যাত্যাগই করতে পারি না।

—আর করবোই বা কেন? যারা উড়ে, মেড়ো, ছাতু, তারাই ভোরে ওঠে। কৃষ্টিমানদের একটু বিলম্ব হবেই।

—তা তো হবেই, কিন্তু বাজারে যে কিছুই নাই দেখিতেছি।

ইতিমধ্যে তাহারা এ-দোকান ও-দোকান দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। দোকানীরা গৌড়ীয়দের ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত, তাহারা বলিতেছে

—ওটা বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

—ওটা অমুকে কিনিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

—ওটা পচা।

এমন সময়ে নরেন্দ্র সকলকে তারস্বরে ডাকিল—ও ভাই, এদিকে এসো, এদিকে এসো।

—কি ব্যাপার?

একদল ফড়িঙের ন্যায় ঠক্কুরগণ সেদিকে ছুটিল, কাছে গিয়া দেখিল, কৃষ্টিমান নরেন্দ্র সেই প্রকাশ্য বাজারে, সহস্র দৃষ্টির সম্মুখে মেনকা বাঈয়ের নৃত্যকে পরাজিত করিয়া নাচিতেছে। তাহার হাতে এক আঁটি শাক আর মুখে শব্দ করিতেছে—ধইন্যা পাতা, ধইন্যা পাতা।

সকলে নৃত্যের কারণ বুঝিল, আরও বুঝিল, ইহার চেয়ে নৃত্যের যোগ্যতর কারণ হইতেই পারে না, কাজেই তাহারাও নৃত্যপর নরেন্দ্রকে ঘিরিয়া নাচিতে লাগিল। সকলেরই মুখে 'ধইন্যা পাতা, ধইন্যা পাতা'!

বাজারের লোক অবাক। ঠকুরদের এমন বিহ্বল অবস্থা তাহারা আগে দেখে নাই। কিন্তু সর্বজ্ঞ হইলে তাহারা বুঝিতে পারিত, যে-কারণে কলম্বাস অকূল সমুদ্রে ভগ্ন বৃক্ষশাখা দেখিয়া উল্লসিত হইয়াছিল, ইহাদের উল্লাসের কারণও তাহা হইতে ভিন্ন নয়। গৌড়বাসীর একটি শ্রেষ্ঠ সুখাদ্য ধনেপাতা। বিদেশে বহুকাল পরে অকস্মাৎ সেই ধনেপাতা আবিষ্কাব করিয়া তাহারা যেন স্বদেশকেই আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। এমন অবস্থায় আত্মবিস্মরণ সম্ভব এবং তাহা মার্জনীয়।

বিহ্বল অবস্থা কাটিলে নরেন্দ্র দোকানীকে শুধাইল—কত দাম?

বেচারা দোকানী ঠকুবদেব উল্লাস দেখিয়া দাম চড়াইয়া দিল, বলিল—চার কড়ি।

—চার কড়ি!

—সোনার চাঁদ' আর কি!

—অর্ধেক রাজত্ব!

—তার সঙ্গে রাজকন্যা!

—কিছু না দিলেই ওর যথার্থ দণ্ড হয়!

ঠিক, ঠিক, ওকে কিছু দেওয়া নয়—বলিয়া সকলে গৃহাভিমুখে ছুটিল, পিছু পিছু আব সকলেও ছুটিল; তাহাদের মুখে 'ধইন্যা পাতা, ধইন্যা পাতা' ধ্বনি। তাহাদের উত্তরীয়, বাবরী, কোঁচা বাতাসে লটপট কবিয়া উড়িতে লাগিল, ময়ূরপঙ্খী জুতা আর্তনাদ তুলিল—সবসুদ্ধ মিলিয়া সে এক বিচিত্র দৃশ্য।

কাশ্মীর হইতে কুমারিকা, প্রভাস হইতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ পর্যন্ত সমস্ত দেশের লোক রুদ্ধবাক্ অবস্থায় গৌড়ীয় ঠকুরগণের দিকে তাকাইয়া রহিল, অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের কথা সরিল না।

অবশেষে একজন শুধাইল—ক্যাও এ লোক বাওরা হ্যায়।

অপরে বলিল—নেহি নেহি, গৌড়মে সব লোগোকোঁ এহি হাল হ্যায় !

পূর্বোক্ত ব্যক্তি বলিল— অচ্ছী দেশ ! বাপ রে বাপ !

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—সীয়ারাম। সীয়ারাম।

সব্জিওয়ালা বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে নাগানন্দের চতুষ্পাঠীর দিকে ছুটিল।

২

প্রবাসী গৌড়ীয় ছাত্রাবাসের আবাসিকগণ ইতিমধ্যেই ছুটি দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়া তর্ক-বিতর্ক তর্জন-গর্জন করিতে করিতে হঠাৎ একজন আর একজনের পেটে খাগের কলমকাটা চাকু বসাইয়া দিয়াছে।

চাকু মারিয়াছে নরেন্দ্র, চাকু খাইয়াছে ধীরেন্দ্র।

এই ঘটনার পরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় আবাসিকগণ কেবলই কোলাহল করিতেছে। পাড়ার লোকে বিচলিত ভাব দেখায় নাই ; কারণ তাহারা জানে, গৌড়ীয় ছাত্রাবাসে আজ ধনেপাতার শাক আসিয়াছে, আজ অনেক কিছুই ঘটিতে পারে।

নরেন্দ্র ও ধীরেন্দ্র সহপাঠী, সহদেশী, এমন কি তাহাদের সহগ্রামী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমন ক্ষেত্রে একজন কেন অপরের পেটে ছুরি মারিল, জানিবার ঔৎসুক্য হওয়াই স্বাভাবিক।

ধনেপাতা লইয়া ছাত্রাবাসে ফিরিলে একটি গুরুতর সমস্যা দেখা দিল—ধনেপাতা কি অবস্থায় খাওয়া হইবে, কাঁচা না তরকারির সহিত রাঁধিয়া ?

নরেন্দ্র বলিল—আমরা চিরকাল কাঁচা খাইতেছি।

ধীরেন্দ্র বলিল—আমার ঠাকুরমা সর্বদা রাঁধিয়া খাইবার পক্ষে।

—তোমার ঠাকুরমা মূর্খ।

—কাঁচা খাওয়াই তোমাদের স্বভাব, তোমরা গরু।

'তখন ঠাকুরমার প্রকৃতি ও অপর পক্ষের স্বভাব লইয়া যে সব বিশেষণ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, তাহা কেবল গৌড়ীয়গণের মধ্যেই সম্ভব।

তখন সমস্ত ছাত্রই এক এক পক্ষভুক্ত হইয়া গেল এবং উত্তেজনা এমন তীব্রতা পাইল যে, ক্ষণকালের জন্য ধনেশাকের প্রসঙ্গও বিস্মৃত হইল।

তখন দীনেন্দ্র বলিল—ভাই সব, মনে রাখিও, আমরা গৌড়ীয় ছাত্র, সাধারণ উড়ে বা মেড়ো বা ছাতু নই; কাজেই ঝগড়ায় কাজ নাই, ধনেশাক দুই রকমেই প্রস্তুত হোক, যাহার যেমন অভিরুচি খাইবে।

নরেন্দ্র বলিল—এমন হইতেই পারে না, তাহাতে ধনেশাকের অপমান।

ধীরেন্দ্র বলিল— তাহাতে আমার ঠাকুরমার অসম্মান।

আবার কলহ তীব্র হইয়া উঠিল এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া নরেন্দ্র ধীরেন্দ্রের পেটে ছুরিকাযুক্তি প্রয়োগ করিল।

এই হঠকারিতায় কেহ অপ্রস্তুত হইয়াছে মনে হইল না, এমন কি ধীরেন্দ্রের ভাবখানাও বিশেষ অসন্তোষজনক নয়, সে যেন মৌন সম্মতির দ্বারা বলিল— গৌড়ীয়দের মধ্যে এমন হইয়াই থাকে।

কিন্তু সমস্যার তো মীমাংসা হইল না। তখন দীনেন্দ্র বলিল—বৃথা কলহে প্রয়োজন কি? এস, আমরা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনের দ্বারা সিদ্ধান্ত করি।

তাহার প্রস্তাবে সকলে সম্মত হইল।

সমুচিত শিক্ষা

গৌড়দেশে একটি চমৎকার প্রথার প্রচলন আছে। কোন গুরুতর সমস্যার অন্য উপায়ে মীমাংসা না হইলে, সমস্যার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইবার রীতি বর্তমান। যে পক্ষে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সংখ্যা অধিক হয়, সেই পক্ষেরই জিত হইয়া থাকে।

কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তাহাতেও মীমাংসা হইল না, যেহেতু কাঁচা শাক ও রাঁধা শাকের পক্ষে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সংখ্যা সমান সমান হইল। গৌড়ীয় ছাত্রগণ সকলেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল—এখন উপায়!

দীনেন্দ্র আবার নূতন প্রস্তাব করিল, সে বলিল—ভাই, কাঁচাও থাক, রাঁধাও থাক, এস—আজ আমরা নাসাভোজন করি; ব্যাখ্যা করিয়া বলিল—আজ কাঁচা শাকের গন্ধ শুঁকিয়াই ক্ষান্ত হই।

তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে গৌড়ীয়গণ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়াই এমন এক বিকট জয়োল্লাস করিল যে, পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ছাত্রাবাসেব ছাত্রগণ জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ক্যা হুয়া?

গৌড়ীয় ছাত্রগণ বলিল—আরে শিয়ালকা মাফিক 'হুয়া হুয়া' মৎ করো।

গৌড়ীয় ছাত্রগণ অন্যান্য দেশের লোকের প্রতি সৌজন্য-প্রদর্শন দুর্বলতা বলিয়া মনে করে। বিশেষ তাহাদের ধারণা এই যে, যাহারা গৌড়ীয় ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলিয়া থাকে, তাহাদের প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার না করাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের লক্ষণ।

শেষ পর্যন্ত নাসাভোজন করাই স্থির হইল। মাঝখানে ধনেশাকের আঁটি ঝুলাইয়া রাখিয়া সকলে যথেচ্ছ শুঁকিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং সে দিনের মতো ধনেশাকের প্রসঙ্গ ঐখানেই মিটিয়া গেল।

সমুচিত শিক্ষা

৩

শ্রীনগরে অবস্থিত নাগানন্দ স্বামীর চতুষ্পাঠী একটি ভারতবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। এখানে ভারতের সকল অঞ্চল হইতে বিদ্যার্থী আসিয়া থাকে, গৌড় হইতেও আসে। গৌড়ীয় বিদ্যার্থীরা অধ্যয়নে যেমন পশ্চাৎপদ, নিজেদের ও অন্য দেশের ছাত্রের সঙ্গে কলহে ও দুর্ব্যবহারে তেমনি তাহারা অগ্রণী। অন্য অঞ্চলের ছাত্ররা পরস্পরের ভাষা শেখে। গৌড়ীয়গণ অন্য কোন অঞ্চলের ভাষা শিখিবে না, অন্য কাহারও সঙ্গে মিশিবে না, নিজেদের মধ্যে জটলা করে, নিজেদের ছাত্রাবাসের নাম দিয়াছে 'প্রবাসী গৌড়ীয় ছাত্রাবাস'। অন্য অঞ্চলের ছাত্রগণ শুধু অঞ্চলটির নামটি উল্লেখ করাই যথেষ্ট বোধ করে, এক কথায়, শ্রীনগর শহরে তাহারা ক্ষুদ্র একটি গৌড়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, সমানে সমানে মিল হয়, গৌড় ও অন্যান্য অঞ্চলে শিক্ষা-দীক্ষার এমন তারতম্য, মিলনের ক্ষেত্র কোথায় ?

বৃদ্ধ নাগানন্দ স্বামী পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও চরিত্রের জন্য সর্বজন-শ্রদ্ধেয়, কেবল গৌড়ীয় ছাত্রগণ তাঁহার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাপরায়ণ নহে। গৌড়ীয়গণ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিয়া থাকে, লোকটা পণ্ডিত সন্দেহ নাই, কিন্তু গৌড়ের সীমার বাহিরে জন্মগ্রহণ করিয়াই সব মাটি করিয়া ফেলিয়াছে।

ধনেশাক প্রসঙ্গের পরদিন নাগানন্দ স্বামীর চতুষ্পাঠী বসিয়াছে।

নাগানন্দ স্বামী বলিলেন—গৌড়ীয় ছাত্রদের যে দেখিতেছি না !

একটি মারাঠী ছাত্র বলিল—আচার্য, তাহারা তো সময়মতো কখনই আসে না।

নাগানন্দ স্বামী বলিলেন—ওটি তাহাদের একটি মহৎ দোষ।

তারপরে বলিলেন—কাল বাজারে কি ঘটিয়াছিল, তোমরা কেহ দেখিয়াছ ?

মারাঠী ছাত্রটি বলিল—ঐ যে তাহারা আসিতেছে। একেবারে তাহাদেরই শুধাইবেন। আমরা কি বলিতে কি বলিব, গৌড়ীয় ছাত্রগণ বড় পরমত-অসহিষ্ণু।

এমন সময় গৌড়ীয় ছাত্রগণ প্রবেশ করিল।

অন্য দেশের ছাত্রগণ প্রথমে আচার্যের পাদবন্দনা করিয়া নিজেদের মধ্যে কুশল সম্ভাষণ করিয়া, তবে আসন গ্রহণ করে, ইহারা সেরূপ কিছুই করিল না। আচার্যের দিকে মাথা দিয়া একটা ঢুঁ মারিবার ভঙ্গী করিয়া সকলে একান্তে বসিয়া পড়িল এবং অনতিনিম্ন-স্বরে কথাবার্তা বলিতে শুরু করিল।

আচার্য বলিলেন—কাল তোমরা বাজারে কি করিয়াছিলে? একজন দরিদ্র সব্‌জিওয়ালা আমার কাছে অভিযোগ করিয়া গিয়াছে।

নরেন্দ্র বলিল—আপনার কাছে দর্শন পড়িতে আসিয়াছি, পড়ান; ওসব ব্যাপারের মধ্যে আপনি যান কেন?

আচার্য। আমি আর গেলাম কই! দায়ে পড়িয়া সে লোকটা আমার কাছে আসিয়াছিল।

নরেন্দ্র। আপনি রাজা না কোটাল? আপনার কাছে আসে কেন?

আচার্য। তোমাদের গৌড়দেশের রীতি কি জানি না। অন্য সর্বত্র আচার্যের স্থান—রাজা ও কোটালের উপরে। একথা নিতান্ত অশিক্ষিতেও জানে, তাই রাজদ্বারে না গিয়া আমার কাছে আসিয়াছিল।

নরেন্দ্র। আপনি আমাদের দেশ তুলিয়া কথা বলিবেন না।

আচার্য। তোমাদের আচরণেই যে তোলায়, অন্যান্য দেশের ছাত্রগণের সঙ্গে তোমাদের প্রভেদ কি বুঝিতে পার না?

নরেন্দ্র। ওরা ছাতু খায়, ভুট্টা খায়, জোয়ার খায়, চানা খায়, পুদিনার শাক খায়।

আচার্য। তাহাতে ক্ষতি কি? যাহার যা খাদ্য।

নরেন্দ্র। ক্ষতি এই যে, ওরা উড়ে, মেড়ো, ছাতু, ভূত।

. এমন সময়ে একটি গুজরাটি ছাত্র বলিল—তোমরা যে ধনেপাতা খাও।

ধীরেন্দ্র। আমাদের খাদ্য তুলিয়া কথা বলিও না।

আচার্য। তোমরা অনেক বেশি তুলিয়াছ।

ধীবেন্দ্র। আপনি উহাদের দিকে টানিয়া বলিলেন।

আচার্য। তোমাদের দিকে ঘেঁষিতে দাও কই?

সেই গুজবাটি ছাত্রটি বলিল—যাহারা তুচ্ছ ধনেশাকের জন্য পবস্পরের পেটে ছুরি মারিতে পারে—

ধীবেন্দ্র। কে বলিল ছুরি মারিয়াছে?

গুজরাটি ছাত্র। তোমার পেটে ও পটি বাঁধা কেন?

ধীবেন্দ্র। তোমার পেটে তো বাঁধিতে যাই নাই, তোমার ক্ষতি কি?

আচার্য। এখন বিতণ্ডা থাক। সব্‌জিওয়ালা দাম পায় নাই, দুটো কড়ি চাহিতেছিল, দিয়া দিও।

নরেন্দ্র। ওর প্রতি আপনার এত দরদ কেন? কিছু ভাগবখরা হইয়াছে বুঝি!

তাহার বাক্যে গৌড়ীয়গণ ছাড়া আর সকলেই অষ্টস্তব্ধ হইয়া গেল। আচার্যের সম্বন্ধে এমন কথা—যাঁহার সম্মুখে স্বয়ং কাশ্মীররাজ আসন গ্রহণ করেন না!

আচার্যের অপমানে অন্যান্য ছাত্রগণ এবারে গর্জন করিয়া উঠিয়া বলিল—এখনি আচার্যের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর।

গৌড়ীয় ছাত্রগণ স্প্রিংএর পুতুলের মতো লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—কখনই নয়, কখনই নয়, প্রাণ থাকিতে নয়।

সরু সরু লিকলিকে কেঁচো যেমন কুণ্ডলীকৃত অঙ্গভঙ্গী করে,

শীর্ণকায় গৌড়ীয় ছাত্রগণের কঙ্কালসার দেহ তেমনি পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতে লাগিল—ইস্, আমাদের এমন অপমান! থাকিত আজ গৌড়রাজের সৈন্য!

আচার্য আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, গৌড়ীয়দের প্রতি বলিলেন—আচরণ সংশোধন করিবার পরে তোমরা এখানে আসিও, আজ বিদায় হও।

গৌড়ীয়গণ চীৎকার করিতে লাগিল—দেখিব, তুমি কেমন ফলনা আচার্য, দেখিব, তুমি কেমন চতুষ্পাঠী কর, সব ভাঙিয়া দিব! আমাদের এখনো তুমি চিনিতে পার নাই, এবারে পারিবে, পারিয়া নাকের জলে চোখের জলে এক হইবে, ইত্যাদি।

৪

পরদিন প্রাতঃকালে নাগানন্দ স্বামী তাঁহার কুটীরের দ্বার খুলিয়াই দেখেন, গৌড়ীয় বিদ্যার্থিগণ ঠিক দরজাব সম্মুখেই সারি বাঁধিয়া শুইয়া আছে, পা ফেলিবার জায়গা নাই।

তিনি শুধাইলেন—বাপু, তোমরা এখানে এভাবে শুইয়া পড়িলে কেন?

একজন বলিল—আমরা প্রায়োপবেশন করিতেছি।

নাগানন্দ। প্রায় উপবেশন আর কোথায়? ইহাকে তো শয্যাগ্রহণ বলে।

গৌড়ীয় বিদ্যার্থী। ইহাই প্রায়োপবেশনের রীতি।

নাগানন্দ। আচ্ছা, না হয় তাহাই হইল; কিন্তু কাশ্মীর রাজ্যে কি আর স্থান ছিল না? আমার দরজার সম্মুখে কেন? বাহির হইব কি উপায়ে?

—আমাদের বুকের উপর দিয়া হাঁটিয়া যান।

নাগানন্দ। তোমাদের যে পাখির বুক, মচ্ করিয়া ভাঙিয়া যাইবে! কিন্তু বাপু, প্রায়োপবেশনের উদ্দেশ্য কি?

—আপনার মত পরিবর্তন করাইতে চাই।

নাগানন্দ। আমার অপরাধ কি?

—কাল আপনি আমাদের অপমান করিয়াছেন।

নাগানন্দ। লোকের ধারণা তো ঠিক অন্যরূপ, তোমরাই আচার্যের সঙ্গে অনার্যোচিত ব্যবহার করিয়াছ।

—আবার অপমান করিলেন। আমাদের অনার্য বলিলেন!

নাগানন্দ। বলিলে অন্যায় হয় না, কিন্তু সত্যই কি বলিয়াছি?

—সে লোকে বিচার করিবে। এই আমরা শুইয়া রহিলাম, আপনি যা পারেন করুন।

অগত্যা নাগানন্দ স্বামী ঘরের মধ্যেই রহিতে বাধ্য হইলেন। অধিকাংশ বিদ্যার্থী শুইয়া রহিল, কেবল জনদুই একটা জগঝম্পা পিটিয়া লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ভিড় জমিয়া গেল।

সকলে অবাক। এমন দৃশ্য তাহারা কখনো দেখে নাই। সকাল গেল, দুপুর গেল, সায়াহ্ন আসিল, না উঠিল বিদ্যার্থিগণ, না থামিল জগঝম্পের বাজনা।

ভিড়ের মধ্য হইতে একজন বলিল—তোমরা কি স্নানাহার করিবে না?

—না।

—তোমরা কি আচার্যকে বাহিরে আসিতে দিবে না?

—তিনি স্বচ্ছন্দে বাহিরে আসিতে পারেন, আমরা আটকাই নাই।

—ইহাকেই তো আটকানো বলে।

—মোটেই নয়, ইহাকে বলে সাত্ত্বিক প্রায়োপবেশন।

—কিন্তু আচার্যও যে প্রায়োপবেশন করিতে বাধ্য হইতেছেন।

—আমরা তাহার কি করিব?

রাত্রি আসিল। ভিড় কমিয়া গেল। কিন্তু প্রায়োপবেশকদল উঠিল না, বাজনাও থামিল না। নাগানন্দ ঘরের মধ্যে বন্ধ রহিলেন, কিন্তু অভুক্ত রহিলেন না। তিনি যোগীপুরুষ, যোগবলে ঘরে বসিয়াই খাদ্যসংগ্রহ করিয়া আহার করিলেন। অভুক্ত বিদ্যার্থীদের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার দুঃখ হইল, ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, যোগবলেও জীবনের সব রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় না। তিনি আধুনিক কালের লোক হইলে নিরম্বু উপবাস করিতে বাধ্য হইতেন।

এই ভাবে তিন-চার দিন গেল। প্রতিদিন ভিড় বাড়িতে লাগিল। সকলে দেখিয়া অবাক হইল যে, বিদ্যার্থিগণ আজ চার দিন অভুক্ত, অথচ দিব্য প্রফুল্লমূর্তি, মুখে ক্লেশ বা অনশনের চিহ্নমাত্র নাই!

কেহ বলিল—উহারা মায়া জানে।

কেহ বলিল—উহারা যোগী।

কেহ বলিল—ক্ষুধাতৃষ্ণা জয় করিবার কৌশল শিখিবার উদ্দেশ্যে একবার গৌড়ে যাইতে হইবে দেখিতেছি।

অবশেষে ব্যাপারটা রাজার কানে পৌঁছিল। তিনি মন্ত্রীকে দিয়া উপবাস ভঙ্গ করিতে বলিয়া পাঠাইলেন। বিদ্যার্থীরা সম্মত হইল না। অবশেষে রাজা কোটালকে আদেশ করিলেন, সৈন্য দিয়া ছাত্রদের যেন ঘিরিয়া রাখে, নতুবা লোকে তাহাদের বিরক্ত করিতে পারে।

এই আদেশ শুনিয়া বিদ্যার্থীরা ঘোরতর আপত্তি করিল, বলিল—তাহা হইলে রাজদ্বারেও আমাদের প্রায়োপবেশন শুরু করিতে হইবে দেখিতেছি।

রাজা বলিলেন—থাক, বাদ দাও, উহাদের ভালোর জন্যই ঘিরিয়া

রাখিবার কথা বলিয়াছিলাম, উহারা না চায়, না-ই ঘিরিয়া রাখিলে, আমার কি শিরঃপীড়া!

আরও চার-পাঁচ দিন গত হইল। রাজা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, একটা অঘটন ঘটিয়া গেলে গৌড়েশ্বর কি বলিবেন! তিনি রাজবৈদ্যকে পাঠাইয়া দিলেন, বলিলেন—যাও, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ, ছাত্রদের শরীরের অবস্থা কিরূপ?

বিদ্যার্থীরা রাজবৈদ্যকে কাছে ঘেঁষিতে দিল না।

রাজা প্রধান অমাত্যগণকে পাঠাইয়া দিলেন—একবার বলিয়া দেখ, অনশন ত্যাগ করে কি না!

বিদ্যার্থীরা কাহারো কথা শুনিল না, বরঞ্চ চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—আগে নাগানন্দ মত পরিবর্তন করুক, তারপরে আমাদের অনুরোধ করিও।

অমাত্যগণের মুখ ভবিষ্যতের আশঙ্কায় কালো হইয়া গেল, তাহারা ভাবিতে লাগিল, রাজাকে গিয়া কি বলিবে।

এমন সময় এক বুড়া মিঠাইওয়ালা তাহাদের কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—কর্তা, আপনারা ছাত্রদের জন্য চিন্তা করিবেন না, তাহারা কদাচ অনাহারে মরিবে না।

একজন কৌতূহলী হইয়া শুধাইল—কেন এমন বলিতেছ?

কিন্তু মিঠাইওয়ালাকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না, ভিড়ের মধ্যে সে কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে।

আরও চার দিন গেল। বিদ্যার্থীদের প্রায়োপবেশনের আজ পঞ্চদশতম দিবস।

গৌড়বাসীর অনশনক্ষমতায় সমস্ত কাশ্মীর হতবুদ্ধি।

একজন বলিল—অনশনেই ওরা অভ্যস্ত, তাই না ওরূপ চেহারা।

আর একজন বলিল—মনের বলই বল, শরীরটা তো তুচ্ছ, নিতান্ত না থাকিলে নয়, তাই আছে।

অপর আর একজন বলিল—যা বল, ওরাই আসল ব্রাহ্মণ, সংস্কৃত উচ্চারণ যেমনি করুক না কেন।

ক্রমে অনেক লোকেই বিদ্যার্থীদের প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ হইয়া উঠিল। তাহারা বিদ্যার্থীদের অপরাধ ভুলিয়া গেল, এমন কি, কেহ কেহ নাগানন্দকেই দোষী সাব্যস্ত করিতে লাগিল। জনমত যখন বিদ্যার্থীদের দিকে ঘুরিবার মুখে, এমন সময়ে এক অঘটন ঘটিল।

সেদিন অনশনের যোড়শতম দিবস। দুইজন গৌড়ীয় বিদ্যার্থী (সেই যাহারা জনমত জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে জগঝম্প পিটিত) অতি প্রত্যূষে ছুটিতে ছুটিতে রাজবৈদ্যের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজবৈদ্য শুধাইল—এত ভোরে! কি সংবাদ?

—আপনাকে একবার যাইতে হইবে।

—কোথায়?

—প্রায়োপবেশন-ক্ষেত্রে।

—সঙ্কট দেখা দিয়াছে বুঝি! আগেই জানিতাম এমন হইবে। হিক্কা, না শ্বাস, না দুই-ই?

—আজ্ঞে দুই-ই।

—হিক্কা আর শ্বাস?

—আজ্ঞে না, ভেদ আব বমি।

—উদরাময়?

—তাই তো মনে হইতেছে।

—কি আশ্চর্য! প্রায়োপবেশনের ফলে উদরাময়, এমন তো শাস্ত্রে লেখে না।

—আজ্ঞে তবু সত্য, কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

—কেন এমন হইল বলিতে পার ?

—আজ্ঞে ঘৃতটা কিঞ্চিৎ নীরেস ছিল ।

—ঘৃত ? এর মধ্যে ঘৃত কোথা হইতে আসিল ?

—এক বেটা বুড়া মিঠাইওয়ালার অনবধানেই এমন ঘটিয়াছে।

—মিঠাইওয়ালা ? তোমরা কি তবে প্রায়োপবেশন কর নাই ?

—আজ্ঞে প্রায় উপবেশন করিয়াছিলাম বলিয়াই এমন দুরবস্থা ঘটিল, শুধু উপবেশন করিলে বোধ করি এমন হইত না।

তারপর রাজবৈদ্যের চিকিৎসার গুণে উদরাময়ের রোগীরা কয়েক দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিল, আর নাগানন্দ স্বামীও গৃহাবরোধ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন।

অতঃপর কাশ্মীররাজ গৌড়ীয় বিদ্যার্থীদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা উপস্থিত হইলে বলিলেন—বৎস, এবার তোমরা দেশে ফিরিয়া যাও।

বিদ্যার্থীরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া বলিল—আমাদের পাথেয়ের অভাব।

রাজা বলিলেন—রাজকোষ হইতে দিতেছি।

বিদ্যার্থীরা বলিল—সঙ্গীর অভাব।

রাজা বলিলেন—কয়েকজন সৈন্য তোমাদের সঙ্গে গৌড় পর্যন্ত যাইবে।

তখন বিদ্যার্থীরা বলিল—আমরা যে চতুষ্পাঠীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি, এমন অভিজ্ঞান-পত্র দিতে হইবে।

রাজা বলিলেন—তাহাও দিতে পারি। কিন্তু তোমরাই জান, কত দূর কি শিখিয়াছ, দেশে গিয়া ধরা পড়িবে না ?

বিদ্যার্থীরা বলিল—আজ্ঞে সে আশঙ্কা নাই ; কারণ দেশের লোকেরা আমাদের চেয়েও মূর্খ !

রাজা বলিলেন—তবে তাহাই হোক। তোমাদের অভীষ্ট সব বস্তুই পাইবে। এখন যাও, প্রস্তুত হও গিয়া।

তারপর একদিন সুপ্রভাতে গৌড়ীয় বিদ্যার্থিগণ রাজব্যয়ে কাশ্মীর ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। চারিদিকের জনতাকে অভিভূত করিয়া দিয়া বিদ্যার্থিগণ 'কাশ্মীর নিপাত যাউক' ধ্বনি করিতে লাগিল এবং পালাক্রমে 'কাশ্মীর নিপাত যাউক' ও 'গৌড় উন্নত হউক' ধ্বনি তুলিতে তুলিতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

তাহারা চলিয়া গেলে, বিস্ময়ের ভাব কতকটা কমিলে, একজন বলিয়া উঠিল—দুনিয়া তো এক আজব চিড়িয়াখানা হ্যায়। ঔব গৌড় উসীমে বন্দরকা মোকাম। সীয়ারাম, সীয়ারাম!

পরিশিষ্ট

বাঙালী-নিন্দুক বলিয়া বর্তমান লেখকের একটা দুর্নাম আছে। এই গল্পটি তাহারই দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য হইবে আশঙ্কা। কাজেই যে উৎস হইতে গল্পটির উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। উক্ত অংশ পড়িলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, হাজার বছর আগেও বাঙালীচরিত্র একই রকম ছিল। তাহার নিন্দা করিবার জন্য কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন, নির্জলা সত্যকথনই যথেষ্ট, আর যিনি এ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তিনিও বাঙালী ছিলেন না। কাজেই বিবরণটিকে ও বর্তমান গল্পটিকে নিরপেক্ষ চিত্র বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কাশ্মীরে গৌড়ীয় বিদ্যার্থী

কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার দশোপদেশ-গ্রন্থে কাশ্মীর-প্রবাসী গৌড়ীয় বিদ্যার্থীদের বর্ণনা দিয়াছেন। দশম-একাদশ শতকে প্রচুর

গৌড়ীয় বিদ্যার্থী কাশ্মীরে যাইতেন বিদ্যালাভের জন্য। ক্ষেমেন্দ্র বলিতেছেন, ইহারা ছিলেন অত্যন্ত ছুঁৎমার্গী। ইহাদের দেহ ক্ষীণ, কঙ্কাল মাত্র সার এবং একটু ধাক্কা লাগিলেই ভাঙিয়া পড়িবেন, এই আশঙ্কায় সকলেই ইহাদের নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিতেন। কিন্তু কিছুদিন প্রবাস-যাপনের পরই কাশ্মীরের জল-হাওয়ায় ইহারা বেশ মেদ ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিতেন। 'ওঙ্কার' ও 'স্বস্তি' উচ্চারণ যদিও ছিল ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত কঠিন কর্ম, তবু পাতঞ্জলভাষ্য, তর্কমীমাংসা প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রই তাঁহাদের পড়া চাই।·· ক্ষেমেন্দ্র আরও বলিতেছেন, গৌড়ীয় বিদ্যার্থীরা ধীরে ধীরে পথ চলেন এবং থাকিয়া থাকিয়া তাঁহাদের দর্পিত মাথাটি এদিক-সেদিক দোলান। হাঁটিবার সময় বিদ্যার্থীর ময়ূরপঙ্খী জুতায় মচ্‌মচ্‌ শব্দ হয়। মাঝে মাঝে তিনি তাঁহার সুবেশ সুবিন্যস্ত চেহারাটার দিকে তাকাইয়া দেখেন। তাঁহার ক্ষীণ কটিতে লাল কটিবন্ধ। তাঁহার নিকট হইতে অর্থ আদায় করিবার জন্য ভিক্ষুক এবং অন্যান্য পরাশ্রয়ী লোকেরা তাঁহার তোষামোদ করিয়া গান গায় ও ছড়া বাঁধে। কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেত দন্তপঙক্তিতে তাঁহাকে দেখায় যেন বানরটি। তাঁহার দুই কর্ণলতিকায় তিন তিনটি স্বর্ণকর্ণভূষণ, হাতে যষ্টি, দেখিয়া মনে হয় যেন সাক্ষাৎ কুবের। স্বল্পমাত্র অজুহাতেই তিনি রোষে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন, সাধারণ একটু কলহে ক্ষিপ্ত হইয়া ছুরিকাঘাতে নিজের সহ-আবাসিকের পেট চিরিয়া দিতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন না। গর্ব করিয়া তিনি নিজের পরিচয় দেন ঠক্কুর বা ঠাকুর বলিয়া এবং কম দাম দিয়া বেশি জিনিস দাবি করিয়া দোকানদারদের উত্যক্ত করেন। (বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, পৃঃ ৫৫১—৫৫২, নীহাররঞ্জন রায়)